শিশু-মন

[illegible]

Price:
RS. 3/-

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব ভোলানাথ দাশ মহোদয়ের
পুণ্য স্মরণে—

ভূমিকা

সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করিতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ কার্যকরী সে কথা আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। শিক্ষা, শিল্প এবং মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা ব্যাপারে আধুনিক মনোবিদ্যার দান অপরিসীম। শিল্প ও মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষাদান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য। কারণ প্রত্যেক গৃহেই পিতামাতাকে পুত্রকন্যাকে শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হয়। শিশুমন সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিদ্যা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করিয়াছে সেগুলি সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা আজকাল আর সম্ভব নয়।

শ্রীমান রমেশ দাশ ছাত্রাবস্থায় শিশুমন ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছিল এবং অধীতবিদ্যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের অভিজ্ঞতাও তার যথেষ্ট আছে। এই পুস্তকখানিতে রমেশচন্দ্র শিশুমন ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে সমস্ত তথ্যই সহজ সরল ভাষায় অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আমি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। পিতামাতা এবং শিক্ষাব্রতী মাত্রেই যে এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেরূপ সুষ্ঠু ও সুচিন্তিতভাবে বিষয়গুলি আলোচিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও অনুমোদন করা যায়।

স্নেহভাজন রমেশচন্দ্রকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। তাহার শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার হউক এবং তাহার শ্রম সফল হউক, ইহাই কামনা করি।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ

২৭ জানুয়ারী, ১৯৫২

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

অধ্যক্ষ, মনস্তত্ত্ব বিভাগ

মুখবন্ধ

শিশু-মন প্রকাশিত হয়েছে যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও প্রেরণায় তাঁদের আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার সুহৃদ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ও শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ শিশু-মনকে প্রকাশিত করে আমাকে ঋণী করেছেন। তাছাড়া শ্রীসমীরকুমার বসু, শ্রীতপনকুমার বসুমল্লিক, শ্রীরণনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেন্দু দত্ত ও শ্রীললিতকুমার সেন এই বইটি লেখায় আমাকে প্রচুর উৎসাহ দান করেছেন। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন গুরুদেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম. এ., ডি. ফিল (লাইপজিগ্) এফ. এন. আই· মহাশয় দয়া করে শিশু-মনের ভূমিকা লেখার ভার গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছেন। তাঁকে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

মুখবন্ধের মুখ বন্ধ করার পূর্বে শিশু-মন রচনার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য আছে সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ শিশুলালনের মহৎ উদ্দেশ্যটিকে কাজে পরিণত করার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে যথাযথভাবে সাহায্য করা, দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ত্বের ছাত্রছাত্রীদের শিশুমন সম্বন্ধে একটা বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি অর্জন করতে সহায়তা করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি যথাযথভাবে পালন করার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত শিশুমনস্তত্ত্বের পাঠ্য-তালিকার প্রতি যথোপযোগী দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

শিশু-মন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। প্রকাশকবর্গের এইটিই ছিল প্রথম প্রকাশন, এবং লেখকের সর্বপ্রথম গ্রন্থপ্রণয়ন প্রচেষ্টার নিদর্শন। প্রকাশক ও লেখক উভয়পক্ষই শিশুমনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত ছিলেন না। কিন্তু বাংলা দেশের জনক-জননী শিশু-মনকে সাদর সম্বর্ধনা জানাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নি। বাংলা দেশের অনেকগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা শিশুমনের অনুকূল সমালোচনা করে তার প্রতি আশাতিরিক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী শিশুমনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে লেখকের শ্রমকে সার্থক করেছেন। এঁদের সকলের সহানুভূতি ও

শুভকামনার প্রভাবেই শিশুমনের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্ভব হলো। তাই তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রথম সংস্করণে শিশুমনের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। ছাপার ভুল, সূচীপত্রের অভাব, খারাপ কাগজ, খারাপ বাঁধাই, আকর্ষণী-শক্তিবিহীন মলাট এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্যতম। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ প্রধানতঃ লেখকের অভিজ্ঞতার অভাব ও ছাপাখানার পাগলামি। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে ভুল-ত্রুটির মাত্রা অসহনীয় হবে না। কিন্তু শিশুমনের দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন আমি প্রবাসে। প্রুফ দেখাও আমার পক্ষে তাই সম্ভব নয়। সুতরাং এই সংস্করণের ভুলভ্রান্তির সমূহ দায়িত্ব রইল প্রকাশকবর্গের উপর। আর একটা কথা বলে মুখবন্ধের সমাপ্তি করছি। দ্বিতীয় সংস্করণে শিশুমনকে নানাভাবে উন্নততর করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার প্রবাস বাস ও সময়াভাবের জন্য সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ হবার সুযোগ পেল না। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি শিশুমনের উন্নতি বিধান করতে। কতকগুলি পরিচ্ছেদ যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও বর্ধিত হয়েছে। "গোড়ার কথা"-কে একটা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে পরিণত করা হয়েছে এবং "শিশুপাঠ পদ্ধতি" শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের মতো শিশুমনের দ্বিতীয় সংস্করণটিও যদি সকলের সহানুভূতি অর্জন করতে সমর্থ হয় তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তাকে মনের মতো রূপ দেবার বাসনা রইল।

লণ্ডন,
১৫ আগষ্ট, ১৯৫৫

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

শিশুরাই জাতির ভাগ্য-বিধাতা। আজ যারা শিশু, তারাই ভাবীকালের সমাজ-নায়ক, রাষ্ট্র-চালক, শিল্পী, বিজ্ঞানী। ভবিষ্যৎ যে ভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে, তারই বিপুল সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বর্তমানে যারা শিশু তাদেরই ভিতর। সুতরাং শিশুর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক অতি নিবিড় সেই বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও পরিচালক-পরিচালিকাদের দায়িত্ব অতিশয় গুরু। তাঁদেরই ওপর নির্ভর ক'রছে একটি বিরাট সম্ভাবনার সফলতা-বিফলতা। একটি বিশাল বটবৃক্ষ সৃষ্টি করতে হলে ক্ষুদ্র বীজটিকে অযত্ন করলে চলবে না। কোমল মাটি, স্নিগ্ধ জল, উজ্জ্বল আলোক, পরিমিত উত্তাপ, পর্যাপ্ত বাতাস দিয়ে একটি পরিপাটি পরিবেশ রচনা করতে হবে। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখির শত্রুতা থেকে বীজটিকে রক্ষা করতে হবে। ঠিক তেমনি একটি শিশুর মধ্যে যে বিপুল ইঙ্গিত আছে তাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে হলে অনেক যত্ন, অনেক চেষ্টা, অনেক সতর্কতা, সাধ্যসাধনার প্রয়োজন। ছোট বলে শিশুকে অবহেলা ক'রলে বা যথাযথভাবে তার প্রতি আচরণ না ক'রলে, শিশু ও সমাজ উভয়েরই ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে। সুতরাং শিশুর প্রতি সকলেরই সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের এতটুকু অসতর্কতা, আমাদের আচরণের এতটুকু অসামঞ্জস্যের ফলে কত রাশি রাশি সম্ভাবনা যে অংকুরাবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে! কত মহামূল্য সম্পদ আমরা নিজের হাতে অপচয় ক'রে ফেলি সে কথা কে জানে!

মানব-সমাজে চিরকালই শিশুর আবির্ভাব হয়েছে, চিরকালই সমাজ শিশুদের লালনপালন ক'রে আসছে একথা খুবই সত্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভালো ক'রে শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে খুব অল্পদিন আগে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, যুদ্ধমান দেশগুলিতে

শিশুদের বিপজ্জনক অঞ্চল হতে সরিয়ে নিরাপদ পরিবেশে নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। হাজার হাজার বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েকে তাদের চিরপরিচিত স্নেহবিজড়িত গৃহ-বেষ্টনী হতে বিচ্যুত ক'রে একত্র সম্মিলিত করার ফলে তাদের হাবভাব আচার আচরণে অনেক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। তখন কর্তৃপক্ষের নজর পড়ল শিশুদের ওপর। বিভিন্ন শিশু-সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য মনস্তাত্ত্বিকেরা আহূত হলেন। এই সব বিজ্ঞানী শিশু-সমস্যাগুলির কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে শিশু-মনের বিচিত্র পরিচয় পেলেন। বিজ্ঞানীদের এই অভাবিত আবিষ্কার শিশুর মন সম্বন্ধে তাঁদের আরও বেশী কৌতূহলী ক'রে তুলল, শিশু-মনের ওপর নানা রকম পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং গবেষণা চলতে লাগল। এই সব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে যে সব মহামূল্য তথ্য আবিষ্কৃত হলো সেগুলিকে সংকলন ক'রে শিশু-মনস্তত্ত্বের ওপর বড় বড় গ্রন্থ রচিত হলো। শিশু-মনের রহস্য উন্মোচন করার এই যে প্রয়াস এর শেষ আজও হয়নি—কোন কালে হবেও না। কারণ বিজ্ঞানের গতি কোনদিনই স্তব্ধ হয়ে পড়ে না, চিরকালই সামনের দিকে এগিয়ে চলে—যদিও সময় সময় এই গতি মন্থর হয়ে আসে।

আজ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিকেরা শিশু-মনের সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন সেগুলির ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি অত্যুন্নত দেশগুলিতে শিশুদের লালনপালন করা হয়। শিশুর শিক্ষা, চরিত্র-গঠন, সংশোধন সব কিছুই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও বিজ্ঞান-প্রীতির, এই রকম পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা আজ খুব বেশী।

শিশুর সঙ্গে যাঁরা মেলামেশা করেন একটু লক্ষ্য করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, শিশুদের মধ্যে এমন নানান রকমের সমস্যা রয়েছে যেগুলির সমাধান একান্তই দরকার। কোন একটি শিশু হয়তো নিতান্ত লাজুক, কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। মার আঁচল ছেড়ে বাহির-বিশ্বে বেরিয়ে আসবার শক্তি তার নেই। ইস্কুলে

যাবার কথা উঠলেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর একটি শিশু হয়তো ভারি দুষ্টু। তার কোন কিছুরই অভাব নেই অথচ সে অন্য ছেলে-মেয়েদের বই চুরি ক'রে আনে, প্রতিবেশীর বাগানে গাছপালা ভাঙে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মারধোর করে। এই ধরনের আরও অনেক সমস্যা শিশুদের মধ্যে অহরহই দেখা যায়। মনস্তাত্ত্বিকেরা একটি বিষয়ে একমত যে জীবনের প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে মানুষ যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার উত্তর-জীবন। "Morning shows the day" এ কথাটা খুবই বিজ্ঞান-সম্মত। বয়স্কদের চিন্তা, ধারণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের আচরণের স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা, সমাজ ও কর্ম-জীবনে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুরই শিকড় নিহিত আছে তাদের শিশু-মনের কোমল মৃত্তিকার ভিতর—বহুবিচিত্র শৈশব অভিজ্ঞতার রূপ ধরে। সুতরাং একটি মানুষের জীবনে তার প্রথম পাঁচ ছয়টি বৎসর অতিশয় মূল্যবান। কিন্তু তার এই অতি মূল্যবান সময়টি কী ভাবে অতিবাহিত হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে তার মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও পরিচালক-পরিচালিকার ওপর—বিশেষ ক'রে তার মাতাপিতার ওপর। "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি"—পন্ডিতপ্রবরের এই উপদেশ বাক্যটি তাই শুধু মুখস্থ ক'রে বুলি আওড়ালে চলবে না—কাজের ভেতর দিয়ে তাকে চরিতার্থ ক'রে তুলতে হবে। শিশু-লালনের মহৎ উদ্দেশ্যটিকে সফল ক'রে তুলতে হ'লে শিশু-মন সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা থাকা দরকার।

শিশু-পাঠ পদ্ধতি

শিশু-মনস্তত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নিলেও পাঠকের মনে সর্বপ্রথমে যে প্রশ্নটির সঞ্চার হয় সেটি হলো নিম্নরূপঃ--কী কী উপায়ে আমরা শিশু-মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান আহরণ ক'রতে সমর্থ হই? অর্থাৎ শিশু-মন পাঠ করার বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতিটা কেমন? যে যে পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে শিশুমনোবিজ্ঞানী শিশুর মনের বিজ্ঞান রচনা করেন সেগুলো যদি অভ্রান্ত না হয় তাহলে শিশুমনোবিজ্ঞান ভ্রান্তিমুক্ত হ'তে পারে না। সুতরাং শিশুমনোবিজ্ঞানী শিশুর মন সম্বন্ধে কী কথা ব'লছেন শোনার আগে পাঠক স্বভাবতঃই জানতে চান কী ক'রে শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশুমনের গোপন খবরটা জানতে পেরেছেন সেই কথা। যাঁরা বয়স্ক তাঁরা ইচ্ছে করলে নানাভাবে তাঁদের নিজেদের মনের খবর জানবার ও জানাবার জন্য বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করতে পারেন; কিন্তু আমরা সবাই জানি এই বিষয়ে বয়স্কদের সহায়তা অর্জন করতে গিয়েও বৈজ্ঞানিককে অনেক সময় হিমসিম খেতে হয়। তার কারণ বয়স্করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের মনের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করেন না, কারণ এই সব কথা প্রকাশ পেলে তাঁদের আত্মসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বৈজ্ঞানিককে আপন মনের যে খবরটা পরিবেশন করেন সেটাও সত্য নয়, হয় জ্ঞাতসারে না হয় অজ্ঞাতসারে তাঁরা আপন মনের একটা বিকৃত রূপ বৈজ্ঞানিকের চোখের সামনে তুলে ধরেন। যে সব ইচ্ছা প্রবৃত্তির সঙ্গে সমাজবোধের প্রচণ্ড সংঘাত লাগে সেগুলো অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে বিসর্জিত হয়। আমরা তখন এই সব ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকি না বটে, কিন্তু তারা নানাভাবে অহরহ আমাদের চিন্তা, কর্ম, অনুভূতি, স্মরণশক্তি ইত্যাদি যাবতীয় মানসিক

কর্মকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের আপন আপন অবচেতন মনের উপাদানগুলি সম্বন্ধে আমাদেরই অজ্ঞতাবশতঃ সদিচ্ছা থাকলেও আমরা সহজভাবে বিজ্ঞানীকে আমাদের আপন মনের গভীরতম প্রদেশের সঠিক খবরটা দিতে পারি না। [মনঃসমীক্ষক নানাভাবে আমাদের মনকে বিশ্লেষণ ক'রে গভীরতম মনের গোপনতম খবরটা উদ্ঘাটন ক'রতে সমর্থ হন।] বয়স্কদের মনের সংবাদ সংগ্রহ করা যদি এমন কঠিন হয় তাহলে স্বভাবতঃই সংশয় জাগে শিশুমন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা সত্যি সম্ভবপর কী না। যারা অতিশয় শিশু তারা কথাই বলতে পারে না। যারা কথা বলতে পারে তারা আবার সব সময় গুছিয়ে সকল কথা বলতে পারে না। যারা আবার গুছিয়ে কথা বলতে পারে তাদের সকল কথা সব সময় সত্যি হয় না। তারাও ভয়ে ভাবনায় অথবা শিক্ষার দোষগুণে অনেক সময় সত্যি কথাটা প্রকাশ করে না। তদুপরি তাদের গভীরতম মন সম্বন্ধে তারাও বয়স্কদের মতোই অজ্ঞ। সুতরাং শিশুমনোবিজ্ঞানী শিশুমনের খবর পান কী ক'রে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশুমন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে অপরাপর বৈজ্ঞানিকেরই মতো প্রধানত দুটি পন্থা অবলম্বন ক'রে থাকেন। পন্থা দুটির নাম (ক) পর্যবেক্ষণ ও (খ) পরীক্ষা। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ একটা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিভিন্ন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বয়সের বহু শিশুর বিশেষ বিশেষ আচরণ লক্ষ্য করার বৈজ্ঞানিক নাম শিশু-পর্যবেক্ষণ। শিশু জন্ম-মুহূর্ত থেকে সুরু ক'রে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কী কী করে—কখন রাগ করে, কখন খুশী হয়, কখন চলতে শেখে, কখন বলতে শেখে, কী কী ধরনের কথা বলে, কেমন ক'রে নতুন নতুন কাজ করতে শিক্ষালাভ করে ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষ্য করলে শিশুর দেহমনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। মোটামুটি একইরূপ পরিবেশে কিংবা পরিবেশের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও

যদি প্রায় সকল শিশুই মোটামুটিভাবে দেহমনের পরিপুষ্টির একটা সাধারণ ধারা মেনে চলে তাহলে শিশু-মনের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে শিশুমনোবিজ্ঞানী বিচিত্র তথ্য সংকলন করতে সমর্থ হন। পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং সকল পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক মূল্য সমান নয়। আমরা প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে শিশুর সংস্পর্শে এসে থাকি এবং শিশুর সম্পর্কে আমাদের সকলেরই এক একটা ধারণা আছে। শিশু সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যে ধারণা তার মূলে আছে শিশু-পর্যবেক্ষণজনিত আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সব সময় বিজ্ঞানসম্মত নাও হতে পারে। তার কারণ শিশুমন সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান আহরণ করার উদ্দেশ্যেই আমরা শিশুদের পর্যবেক্ষণ করি না। আমাদের ঘরে বাইরে, আমাদের পরিবেশে শিশুরা বিচরণ করে, তাই আমরা তাদের লক্ষ্য না ক'রে পারি না। কিন্তু শিশুদের লক্ষ্য করার পশ্চাতে আমাদের কোন সুচিন্তিত উদ্দেশ্য থাকে না বলেই তাদের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মায় সেটা আংশিক, অসম্পূর্ণ এবং সাময়িক হতে বাধ্য। তাছাড়া আমরা যখন শিশুদের, বিশেষ ক'রে আপন আপন শিশুদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করি তখন তাদের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা ভালবাসা বশতঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা শিশুদের কার্যকলাপকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে থাকি। হৃদয়াবেগ ছাড়া আরও একটা কারণে শিশু-পর্যবেক্ষণ কলুষিত হয়ে থাকে। সেটা হলো আমাদের পূর্বকল্পিত অথবা বিভিন্ন উৎস হ'তে সংগৃহীত বহুবিচিত্র ধারণা। উদাহরণস্বরূপ আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি শিশু স্বর্গের কুসুমের মতো নিষ্কলুষ। সে স্বর্গীয় দেবদূতের মতো নিষ্পাপ। পূর্বকল্পিত অনুরূপ ধারণা থাকার জন্য আমরা অনেক সময় শিশুর মধ্যে তথাকথিত পাশব প্রেরণার যে সব অভিব্যক্তি ঘটে সেগুলোকে হয় লক্ষ্য করি না, না হয় অস্বীকার করি।। শিশুও যে বয়স্কদের মতোই মানবসুলভ প্রেরণারাশির অধিকারী, আজকের

শিশুটিরই মধ্যে যে কালকের পূর্ণবয়স্ক মানুষটির সমূহ প্রেরণা সম্ভাবনার রূপ নিয়ে আছে এবং এই সব প্রেরণা যে ধীরে ধীরে শিশুর মধ্যে প্রকাশ লাভ করতে বাধ্য এই সহজ সত্যটা আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না ব'লেই পর্যবেক্ষণজনিত শিশুমন সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যক্তিগত জ্ঞান সেটা বিকৃত কিংবা আংশিক হয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যহীনতা ও আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাববশতঃ অনেক সময় পর্যবেক্ষণ সংস্কারমুক্ত হলেও তার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক মূল্য থাকে না। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও সংলগ্নতা আছে সেটা সাধারণ পর্যবেক্ষকের অন্তর্দৃষ্টির অভাববশতঃ তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমরা সকলেই বিভিন্ন বস্তুকে অহরহ শূন্য হতে ভূতলে পতিত হ'তে দেখছি, কিন্তু এই সব ভূতলগামী বিভিন্ন বস্তুর পশ্চাতে যে অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি কাজ ক'রছে সেটা একমাত্র নিউটনই লক্ষ্য করেছেন। তেমনি সাধারণ পর্যবেক্ষক শিশুর বিভিন্ন আচরণ লক্ষ্য ক'রে থাকেন, কিন্তু এই সব একক আচরণের মধ্যে যে সংলগ্নতা যে সামঞ্জস্য আছে, তাদের পশ্চাতে আছে যে মানসিক শক্তি সেটা একমাত্র শিশুমনোবিজ্ঞানীই লক্ষ্য করতে সমর্থ হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে প্রভেদ অনেক বেশী। অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক (ক) কোনরূপ সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন না; (খ) হৃদয়াবেগবশতঃ যা পর্যবেক্ষণ করেন তার বিকৃত ব্যাখ্যা করেন; এই ব্যাখ্যা অতিরঞ্জিত বা অসম্পূর্ণ হ'তে পারে; (গ) তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ দ্বারা আবিষ্কৃত ঘটনাবলী সুসম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেন না, তাই সাধারণত তাঁর অভিজ্ঞতার পরমায়ু ও পরিণতি নির্ভর করে তাঁর স্মরণশক্তির তীক্ষ্ণতা ও পারদর্শিতার উপর; (ঘ) তিনি যে সব বিচিত্র ঘটনা লক্ষ্য করেন সেগুলির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না, এবং (ঙ) তাঁর পর্যবেক্ষণগত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তাঁরই ব্যক্তিগত জ্ঞান হয়ে থাকে, অর্থাৎ অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান-

সম্মতভাবে মিলিয়ে দেখেন না। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক (ক) সুনিশ্চিত সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; (খ) হৃদয়াবেগ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, পূর্বকল্পিত ধারণা ইত্যাদির কবল হতে আপন দৃষ্টিকে মুক্ত রাখেন; (খ) পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্ন ও সহজ ভাষায় যা লক্ষ্য করেন তাই লিপিবদ্ধ করেন; (ঘ) সম্পূর্ণভাবে যুক্তির সাহায্যে পর্যবেক্ষণগত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে প্রকৃত অর্থের অন্বেষণ করেন; এবং (ঙ) অপরাপর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত মিলিয়ে দেখেন। সাধারণত বহু বৈজ্ঞানিক স্বতন্ত্রভাবে অনুরূপ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ক'রে যদি একইরূপ ঘটনা বা আচরণ লক্ষ্য করেন তাহলে স্বীকার করতে হবে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ব্যক্তিগত কুসংস্কার দোষে দুষ্ট নয় এবং তাঁরা সকলেই স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রেও যে সব সাধারণ জিনিস লক্ষ্য করেছেন সেগুলো তাদের কল্পনাসঞ্জাত নয়, সেগুলো পরিস্থিতিটারই বাস্তব রূপ। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের নিয়মানুসারেই শিশুমনোবিজ্ঞানী শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকেন।

শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশু-মন পাঠ করার উদ্দেশ্যে অপর যে পন্থাটি অবলম্বন করেন তার নাম পরীক্ষা। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য শুধু একটা। পর্যবেক্ষকের পরিস্থিতি বা পর্যবেক্ষণ-ক্ষেত্রটি তাঁর আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু পরীক্ষকের পরিস্থিতিটি তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁরই আয়ত্তাধীন। শিশু-পরীক্ষক পরীক্ষাগারে ইচ্ছামত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন এবং সেই সব পরিস্থিতিতে শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন। পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন খেলার আয়োজন ক'রে, অঙ্কন, সঙ্গীত, কাহিনী, গাছপালা, পশুপাখি, ইতিকথা, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিচিত্র কাজ সামগ্রী ও বিষয়ের প্রবর্তন ক'রে এদের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে বোঝা যায় কোন্ কোন্ শিশু কী কী ভালবাসে, কোন্ দিকে তাদের

আগ্রহ প্রবল, কোন্ ধরনের শিশুরা কী ধরনের খেলা ভালবাসে, বিভিন্ন বয়েসের শিশুর ছবি আঁকার পদ্ধতিটা কেমন, কে বা কারা অন্যের সঙ্গে সহজভাবে মিলেমিশে খেলা ও কাজ করতে পারে, কারা পারে না, কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে তারা রাগ করে, খুশী হয়, ভয় পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। শিশু-পরীক্ষক শিশুর বুদ্ধি পরীক্ষা করেন তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ক'রে। প্রথমে তিনি শিশুকে হয়তো খুব সহজ একটা কাজ করতে বলেন। শিশু তাতে কৃতকার্য হ'লে তাকে আর একটু কঠিন একটা কাজ দেওয়া হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে কাজের জটিলতা বেড়ে চলে। একই বয়েসের বহু শিশুকে এইরূপ ক্রমশ জটিল কাজ করতে দিয়ে শিশু-মনোবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন কোন্ বয়েসের বেশীর ভাগ শিশু একটা বিশেষ কাজ নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম। স্বল্পতম যে বয়েসের অধিকাংশ শিশু 'ক' কাজটা নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করেছে সেটা যদি পাঁচ বছর হয় তাহলে ধরে নেওয়া হয়, যে একক শিশুটি 'ক' কাজটি নির্ভুলভাবে নিষ্পন্ন ক'রেছে তার মানসিক পুষ্টির পরিমাপ পাঁচ। অর্থাৎ সে যে কাজটি ক'রেছে সেটি করতে পারে পাঁচ বছরের এবং পাঁচের অধিক বছর বয়েসের অধিকাংশ শিশু, কিন্তু পাঁচ বছরের কম যাদের বয়েস তাদের অধিকাংশই একাজটি করতে পারে না। একথার অর্থ এই নয় যে, যেসব শিশুর বয়েস পাঁচ বছরের কম তাদের মধ্যে কেউই 'ক' কাজটি করতে পারবে না। কোন একটি বিশেষ শিশুর বয়েস পাঁচ বছরের কম হলেও তার মানসিক পুষ্টি পাঁচ বছর বয়েসের অধিকাংশ শিশুর মতো হ'তে পারে। সুতরাং কোন একটি চার বছরের শিশু যদি নির্ভুলভাবে 'ক' কাজটি করতে পারে তাহলে ধরে নিতে হবে তার বয়েসের তুলনায় তার মানসিক পুষ্টি বেশী অগ্রসর। অবশ্যই একটি মাত্র কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করেই শিশু-মনোবিজ্ঞানী কোন একটি বিশেষ শিশুর বুদ্ধি নিরূপণ করেন না, তিনি এই ধরনের বহু কাজের ফলাফল বিবেচনা করেন। তাছাড়া কোন একটি বিশেষ শিশু যদি কোন একটি বিশেষ কাজ

করতে কোন এক সময়ে অক্ষম হয় তাহলে তার সেই কাজ করার ক্ষমতা নাই এরকম মনে করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কোন একটা বিশেষ সময়ে একটা কাজ না করতে পারার অনেক কারণ থাকতে পারে। সেই সময়ে এই কাজটা করার ইচ্ছা বা আগ্রহ শিশুর না থাকতে পারে, অন্য দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। তার মানসিক অবস্থা তখন বিক্ষুব্ধ থাকতে পারে; রাগ, অভিমান, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভীতি, স্বপ্নবিলাস ইত্যাদি নানাকারণে শিশুর মনের অবস্থা এমন হতে পারে যে, সে কাজে একাগ্রতা আনতে পারে না। সুতরাং তার কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তার বুদ্ধির পরিমাপ করা সমীচীন নয়। তাই পরীক্ষক পরীক্ষাগারে এই সব বিষয়ের প্রতি সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখেন এবং যাতে এগুলো শিশুর কাজে বাধার সৃষ্টি না করতে পারে সে সম্বন্ধে সম্ভবপর সতর্কতাসমূহ অবলম্বন করেন। তাছাড়া একদিনের বা একটা কাজের ফলাফলের উপর তিনি নির্ভর করেন না। দীর্ঘকাল ধরে বিচিত্র কাজের ফলাফল বিবেচনা ক'রে যথাসম্ভব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি তাঁর মতামত ঠিক করেন। শিশু-মনের বিভিন্ন দিক আছে এবং বিভিন্ন-ভাবে শিশুমনের উপর পরীক্ষা করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বিশেষ করে বুদ্ধি পরীক্ষার কথাটা বলা হলো।

শিশুমন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার আরও অনেক উৎস আছে। শারীরবিজ্ঞানবিদেরা তাঁদের পরীক্ষার ভিত্তিতে শিশুর বিভিন্ন দৈহিক বিশিষ্টতার সঙ্গে তার বিভিন্ন মানসিক বিশিষ্টতার কিরূপ নিবিড় সম্বন্ধ তার উল্লেখ করেছেন। দেহাভ্যন্তরের কোন্ গ্রন্থির বিকাশের উপর বুদ্ধির বিকাশ নির্ভর করে, রাগ আনন্দ ইত্যাদির অনুভূতি কোন্ কোন্ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বিচিত্র ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কীভাবে জনক-জননী শিশুর বংশধারা নিয়ন্ত্রিত করেন, যৌবনোদ্গমে কেমন করে দৈহিক পরিবর্তনের প্রচণ্ডতা মনোরাজ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে ইত্যাদি অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার ক'রে শারীরবিদ্ মনোবিদের কাজকে সহজ করেছেন।

তাছাড়া মনঃসমীক্ষকেরা বয়স্কদের মনোবিশ্লেষণ করে দেখেছেন তাদের ব্যক্তিত্ব যে সব উপাদানে তৈরী সেগুলির মূল নিহিত আছে তাদের শৈশবের অভিজ্ঞতায়। (শিশুকে প্রশ্ন ক'রে, তার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে, তার কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে, তার অঙ্কিত চিত্রাদি বিশ্লেষণ ক'রে, তার স্বপ্নের অর্থ উদ্ঘাটন ক'রে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার জীবনেতিহাস সংগ্রহ ও হৃদয়ঙ্গম ক'রে মনঃসমীক্ষক শিশুর মনের গভীরতম প্রেরণা ও প্রবৃত্তিগুলির সন্ধান লাভ করেছেন। এসব ছাড়া শিশুমনকে জানবার আরও একটা অতি সহজ উপায় আছে, সেটা হলো আমাদের আপন স্মৃতিশক্তি। আমরা সকলেই একদিন শিশু ছিলাম। শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা আমরাও একদিন নিবিড়-ভাবে আস্বাদন করেছিলাম। এখন যদি আমরা স্মরণশক্তির সাহায্যে আমাদের আপন আপন শৈশবে ফিরে যেতে পারি তাহলে শিশুর মনের অনেক খবরই জানতে পারবো। কিন্তু এই উপায়ে শিশুমন জানার চেষ্টা দোষমুক্ত নয়। তার কারণ আমরা আমাদের শৈশবের অনেক অভিজ্ঞতা ভুলে গেছি, অনেক আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন ক'রেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বয়স্ক কামনা বাসনা শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তবু আমার মনে হয় চেষ্টা করলে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে পারি এবং শৈশবস্মৃতির সাহায্যে শিশুর মনকে অনেকটা বুঝতে পারি।

বংশধারা ও পরিবেশ

অনেক দিন আগে থেকেই মানুষ একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য ক'রে আসছে। সেটি হলো বংশ-ধারা। গোলাপের চারা থেকে যতো অজস্র ফুলই ফুটে উঠুক না কেন তারা গোলাপ ফুলই হবে, চাঁপা কী চামেলি নয়। ছাগ-জননীর সকলগুলি সন্তানই ছাগ-শিশু। বিহঙ্গ-জননী বিহঙ্গেরই জন্ম-দায়িনী। পৃথিবীতে যতো রকমের বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এবং মানুষ আছে তারা সকলেই নিজের নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেই বংশ বিস্তার ক'রে থাকে অর্থাৎ তাদের স্বভাব-গত বিশিষ্টতার ধারাটি বংশপরম্পরায় একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে বয়ে চলে।

যে কেউ লক্ষ্য ক'রলেই দেখতে পাবেন সন্তানেরা সাধারণত জনক-জননীর অনুরূপ হয়ে জন্মায়। এ কথাটা অবশ্যই সত্য যে শিশুমাত্রই তার মাতা অথবা পিতার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে জন্মায় না। যাঁরা আবার শিশুর মধ্যে মাতা এবং পিতা উভয়েরই বিশিষ্টতা-গুলির সমষ্টি আবিষ্কার করার আশা পোষণ করেন তাঁদেরও হতাশ হতে হয়। কিন্তু মাতা অথবা পিতা কোন একজনের কোন একটি বিশেষ লক্ষণ বা গুণ যে শিশুর মধ্যে প্রকাশলাভ ক'রেছে পর্যবেক্ষণ ক'রলে অতি সহজেই এটা চোখে পড়ে। স্বামীর চোখের তারা যদি রক্তাভ আর স্ত্রীর চোখের তারা যদি নীলাভ হয়, তাহলে তাঁদের সন্তানের চোখের তারার রঙ সাধারণত লোহিত ও নীলের মাঝামাঝি না হয়ে, হয় রক্তিম না হয় নীলিম হয়ে থাকে। জনক-জননীর মধ্যে যেসব গুণের চিহ্নমাত্র নেই, এমন অনেক গুণও সন্তানের মধ্যে প্রকাশলাভ ক'রতে পারে। পিতামহ, মাতামহ কিংবা আরও ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের বিশিষ্টতা অথবা দূর বা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের গুণাগুণও শিশুর মধ্যে প্রকটিত হয়ে উঠতে পারে। আপন

পরিবার ও পরিজনের সঙ্গে শিশুর রূপ-গুণগত যে সাদৃশ্য রয়েছে ভিন্ন পরিবার ও ভিন্ন জনের সঙ্গে তার সে রকম সাদৃশ্য নেই। বংশধারার গতি অনুধাবন ক'রেছেন যাঁরা তাঁরা আরও একটা বিষয় লক্ষ্য ক'রেছেন। একজন বড়ো বৈজ্ঞানিকের সন্তান যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই হয়ে উঠবে তেমন কোন কথা নেই, তবে সে বড়ো দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক অথবা শিল্পী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে সন্তান জনকের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা লাভ ক'রেছে তা একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠার প্রেরণা নয়—যে কোন বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করার ক্ষমতা। যে সব জনক-জননী অতিশয় উত্তেজনা-প্রবণ তাঁদের সন্তানেরা সাধারণত জড়বুদ্ধি, উন্মাদ, অথবা চঞ্চল-চিত্ত হয়ে থাকে। আরও একটা অনুধাবনীয় বিষয় হলো এই যে, বংশধারাটি জন্মক্ষণেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে ওঠে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনের বিশেষ বিশেষ পুষ্টি সম্পাদিত হয়। এই পরিপুষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন বংশগত গুণাগুণ বিকশিত হয়ে উঠে। মাতাপিতার যে সব শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ সন্তানের মধ্যে এতকাল লক্ষিত হয়নি অনেক সময় তার যৌবনোদ্গমে সেগুলি ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে থাকে। ধর্মযাজক মেণ্ডেল একটি অতি নিভৃত গির্জার প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে গাছপালা ফলফুলের বিচিত্র প্রজনন দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করার পর বংশধারার রহস্যময় গতিটি আবিষ্কার ক'রতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মতে বংশগত গুণগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—প্রকট আর প্রচ্ছন্ন। একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন গুণের সমাবেশ ঘটলে প্রকট গুণটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, প্রচ্ছন্ন গুণটি বিকশিত হতে পারে না, নিদ্রিত থাকে। একটি হয় সম্ভাবিত, অপরটি থাকে সম্ভাবনা। যদি লাল রঙটি প্রচ্ছন্ন আর নীল রঙটি প্রকট হয়, তবে একটি রক্তকমলের সঙ্গে একটি নীলকমলের সংমিশ্রণে যে সব উদ্ভিদের উৎপত্তি হবে তাদের সকলগুলিতেই নীল-কমল ফুটবে। কিন্তু এই নীল-কমল-গুলি স্ব-নিষিক্ত হলে যে সব উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে তাদের চার

ভাগের এক ভাগ থেকে প্রতিবারেই বিশুদ্ধ নীলের সৃষ্টি হবে। বাকি তিন ভাগের একভাগ থেকে সব সময়ই বিশুদ্ধ রক্তকমলের উৎপত্তি ঘটবে। অবশিষ্ট দুভাগ নীল থেকে যে সব উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে, তাদের আবার চার ভাগের এক ভাগ থেকে সব সময়ই অবিমিশ্র নীল কমলের উৎপত্তি হবে। বাকি তিনভাগের একভাগ থেকে বংশ-পরম্পরায় রক্তকমলের সৃষ্টি হবে। এই নিয়মেই বংশবিস্তার ঘটতে থাকবে। ফুলের বেলায় যে নিয়ম মানুষের বেলায়ও তাই। কিন্তু মানুষের বেলায় এই নিয়মের সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না, তার কারণ প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যেই বংশ-বিশুদ্ধি নেই বললেই চলে। বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের মধ্যে অনিবার্য কারণে সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং অহরহ ঘটছে। তা সত্ত্বেও বহু মহামূল্য গবেষণার ফলে এমন কতকগুলি গুণাগুণের সন্ধান মিলেছে যারা বংশ হতে বংশান্তরে মেণ্ডেল-নীতি অনুসরণ ক'রে চলে। বুদ্ধিহীনতা এমনি একটি গুণ। মেণ্ডেল-বাদ অনুসারে এটি একটি প্রচ্ছন্ন গুণ। যার বংশে কোন কালেই কোন বুদ্ধিহীন পুরুষ বা নারীর জন্ম হয়নি এমন একটি লোকের সঙ্গে যদি একটি জড়বুদ্ধি রমণীর মিলন ঘটে তা হলে যে সব বংশধরের উৎপত্তি হবে তারা কেউই জড়বুদ্ধি হবে না। কিন্তু মাতাপিতা দুজনে স্বাভাবিক হলেও উভয়েরই বংশে ইতিপূর্বে যদি বুদ্ধিহীন নারী বা পুরুষের জন্ম হয়ে থাকে তাহলে তাদের চারটি সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ একটি হবে বুদ্ধিহীন।

মাতার দেহ হতে একটি জীব-কোষ এবং পিতার দেহ হতে আগত আর একটি জীব-কোষের সম্মিলনের ফলে সন্তানের উৎপত্তি ঘটে। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে ক্রোমোসোম বলে কতকগুলি পদার্থ আছে। ক্রোমোসোমগুলির ভেতর আবার অনেকগুলি ছোট ছোট পদার্থ থাকে। তাদের নাম জীন। জীনগুলিই বংশগত গুণাবলীর আবাস-ভূমি। প্রত্যেকটি কোষেই সমসংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কোষে আছে চব্বিশ জোড়া ক্রোমোসোম।

যখন একটি পুংকোষ ও একটি স্ত্রী-কোষ পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয় তখন তাদের প্রত্যেকেই আপন আপন অঙ্গ হতে অর্ধেকগুলি ক্রোমোসোম পরিত্যাগ করে। সুতরাং একটি পরিপক্ব পুংকোষ অথবা স্ত্রীকোষে মাত্র চব্বিশটি ক্রোমোসোম বর্তমান থাকে। এইরূপ দুটি কোষের সংমিশ্রণে যে নূতন কোষের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে থাকে আটচল্লিশটা ক্রোমোসোম। কিন্তু প্রত্যেকটা ক্রোমোসোম আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এক একটি পিতৃ-ক্রোমোসোম এক একটি মাতৃ-ক্রোমোসোমের সঙ্গে যুগল অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে। একই মাতাপিতার সকলগুলি সন্তান এক রকম হয় না তার কারণ মাতৃকোষ ও পিতৃকোষের মিলনের পূর্বে যে যে ক্রোমোসোমগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে সকলের ক্ষেত্রেই সেগুলি এক নয়। ক্রোমোসোমগুলিই বংশগত গুণাগুণের পরিবাহক। তাই বিভিন্ন সন্তানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রোমোসোমের সমাবেশ ঘটায় তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণের প্রকাশ ঘটেছে।

যমজ সন্তানদের লক্ষ্য করলে সহজেই বংশধারার প্রভাবটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। একটি মাত্র সম্মিলিত কোষ থেকে যে দুটি সন্তানের সৃষ্টি হয় তাদের দেহ ও মনের সাদৃশ্য সত্যসত্যই বিস্ময়কর। একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করে দেখা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই রকম যমজদের নিয়ে ঔপন্যাসিকেরা অনেক চমকপ্রদ কাহিনী রচনা করেছেন। সাহিত্যপিপাসু মাত্রই সে খবর রাখেন। এদের চেহারার ঢঙ, চোখ চুল গায়ের রঙ, চলন বলন, স্বভাব চরিত্র, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় একই রকম। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশেও তাদের এই অদ্ভুত সাদৃশ্য বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ থাকে। একই সময়ে নিষিক্ত দুটি কোষ হতে যে দুটি সন্তানের সৃষ্টি হয় তাদের বলে বিসদৃশ যমজ। সদৃশ যমজদের মতো না হ'লেও সাধারণ ভাইভগিনীদের মধ্যে যে মিল দেখা যায় বিসদৃশ যমজদের মধ্যেও সেরূপ মিল লক্ষিত হয়।

একটি শিশু তার মাতাপিতা অথবা পূর্বপুরুষদের কতকগুলো

গুণাগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একথাটা ঠিক, কিন্তু তার এই গুণাগুণ-গুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠবে কিনা সেটা নির্ভর ক'রছে তার পরিবেশের প্রকৃতির ওপর। পরিবেশ যদি অনুকূল হয় তবে যে সব বিশিষ্টতা তার মধ্যে সম্ভাবনা হয়ে আছে সেগুলি যথাকালে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়ে উঠবে। আর যদি পরিবেশ প্রতিকূল হয় তাহলে সম্ভাবনাগুলি সম্ভাবনাই থেকে যাবে, কখনও তাদের উন্মেষ ঘটবে না। গোলাপের চারা থেকে গোলাপ ফুলই ফুটবে—ভুঁই চাঁপা কখনও ফুটবে না। এইটাই গোলাপের বংশধারা। কিন্তু দু-একটা ফুল ফুটবে কী রাশি রাশি ফুটবে, সুন্দর তাজা বড়ো বড়ো গোলাপ ফুটবে কী রুগ্ন বিবর্ণ ফুল ফুটবে সেটা নির্ভর ক'রছে পরিবেশের ওপর—মাটির উর্বরতা, জলবাতাস উত্তাপের উপযুক্ততার ওপর। যে শিশু বুদ্ধির জড়তা নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছে তাকে কখনও তীক্ষ্ণ-ধী ক'রে তোলা সম্ভব হবে না, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রে তার মধ্যে বুদ্ধির যেটুকু সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে সেটাকে পুরোপুরি জাগ্রত করা যেতে পারে। মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব যে কতো বেশী উদাহরণ দিয়ে সে কথাটা বুঝিয়ে দেবার খুব বেশী দরকার হয় না। একটি হিন্দুর শিশু যদি জন্ম থেকে ইংরাজ-সমাজে ইংরাজ ধাত্রীর কাছে লালিত-পালিত হয় তবে কালে সে খাসা ইংরাজ হয়ে উঠবে। সামাজিক পরিবেশ থেকে আমরা সকলেই আমাদের ধর্মমত, আচার-সংস্কার, নীতিবোধ ইত্যাদি সঞ্চয়ন করেছি। জীবন ধারণ করতে হলে প্রাণীমাত্রকেই নিজেকে পরিবেশের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই মানুষের মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল। যারা আমাদের চারপাশে রয়েছে, যারা আমাদের ওপর অহরহ প্রভাব বিস্তার ক'রছে—আমরা তাদেরই মতো চলতে ভাবতে শিখি যাতে ক'রে তাদের সঙ্গে বসবাস করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।

পরিবেশের প্রভাবটা আমাদের জীবনে এতো বেশী যে, অনেকে মনে করেন এইটেই মানব-জীবনে একমাত্র প্রভাব—বংশধারাটা কিছুই

নয়। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই তাই তাঁদের বেশী দৃষ্টি। পরিবেশকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে যে কোন শিশুকে যা খুশি তাই ক'রে গড়ে তোলা যায় এই ধরনের একটা বিশ্বাস তাঁরা অন্তরে অন্তরে পোষণ করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় প্রচুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে। অনেকে মনে করেন এসব ক্ষেত্রে বংশধারা অপেক্ষা পরিবেশের প্রভাবটাই বেশী; এমন কী কেউ কেউ বলেন, এইসব ছেলেমেয়েদের দ্বারা বংশধারার ধারণাটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। তাঁরা বলেন, এদের মাতাপিতা বা পূর্বপুরুষের মধ্যে বুদ্ধির অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও এরা যখন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে তখন এদের বুদ্ধিশক্তি বংশধারালব্ধ হতে পারে না, এটা নিশ্চয়ই পরিবেশের প্রভাবসঞ্জাত। তাঁদের মতে এইসব ছেলেমেয়ে উন্নত পরিবেশের সংস্পর্শে আসে ব'লেই তাদের বুদ্ধি প্রখরতা লাভ করে। উন্নততর পরিবেশের সংস্পর্শে এলে বুদ্ধিশক্তির উন্নতি ঘটে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না, কিন্তু এই কারণেই বুদ্ধিশক্তির প্রাখর্যটা জন্মগত এটা অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। একই রকম অনুকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও সব শিশু সমানভাবে দক্ষতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। যার দক্ষতা লাভ করার সম্ভাবনা আছে শুধু সেই ই উপযুক্ত পরিবেশে দক্ষতা লাভ ক'রে থাকে। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র লেখাপড়ায় ভালো ফল করাটাকেই বুদ্ধিমত্তার একমাত্র পরিচয় ব'লে ধরে নিয়েছি। এখানেই আমাদের ভুল। যে অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেটি লেখাপড়ায় সুফল অর্জন ক'রছে তার মাতাপিতা বা পূর্বপুরুষ যে প্রচুর বুদ্ধির অধিকারী হ'তে পারেন না একথা মনে করা যুক্তিসংগত নয়। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে, তাঁদের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে, তাঁরা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন চেষ্টা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বুদ্ধিশক্তিটা যে বংশধারালব্ধ সেটা বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণত দেখা যায়, সদৃশ যমজের মধ্যে পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বুদ্ধির

আশ্চর্য মিল থাকে। সাধারণ ভাইভগ্নীর মধ্যে বুদ্ধির যে রকম সাদৃশ্য দেখা যায় তার চেয়ে নিবিড়তর সাদৃশ্য দেখা যায় সদৃশ এবং অসদৃশ যমজ ভাই ভগিনীর মধ্যে। এক পরিবারের ছেলেমেয়ের বুদ্ধির সামঞ্জস্য প্রচুর। তাছাড়া শৈশবে যদি দেখা যায় 'ক' শিশুটি 'খ' শিশুর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান তাহলে ক এবং খ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখনও দেখা যাবে, ক খ-অপেক্ষা বেশী বুদ্ধির অধিকারী। অবশ্যই কোন এক বিশেষ সময়ে শারীরিক পীড়া বা মানসিক আলোড়নের ফলে ক-এর বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত বা মন্থর হ'তে পারে এবং খ স্বাভাবিক গতিতে বিকাশ লাভ ক'রে বুদ্ধিসংক্রান্ত বিষয়ে 'খ'-কে অতিক্রম (আপাতদৃষ্টিতে) করে যেতে পারে। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যদি উভয়েরই স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকে এবং পরিবেশ যদি প্রতিকূল না হয় তাহ'লে ক-এর বুদ্ধি সব সময়ই খ-এর বুদ্ধি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর হবে। কোথায় বংশধারার প্রভাব শেষ হয়ে পরিবেশের প্রভাব আরম্ভ হবে বলা শক্ত। কারণ বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটা আর একটার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একজনের বুদ্ধি কতটা প্রখর হবে তার একটা সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে তার বংশধারা আর সেই সীমার মধ্যে তার বুদ্ধির উৎকর্ষ নির্ভর ক'রছে পরিবেশের আনুকূল্যের উপর। পরিবেশের প্রভাব যে অনেক বেশী সেটা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু বংশধারাকে অস্বীকার করার পক্ষপাতী আমরা মোটেই নই। বংশধারার আলোচনা করতে গিয়ে ওপরে যে সব কথা বলা হয়েছে তা থেকেই আমাদের এই মনোভাবের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়। মেণ্ডেলের পরীক্ষা ও যমজদের পর্যবেক্ষণাদির ফলাফল এবং বংশবংশান্তরে জড়বুদ্ধিতা, মনোব্যাধি ইত্যাদি কতকগুলি গুণাগুণের নিয়মিত আবির্ভাব থেকেই বংশধরের ওপর বংশধারার প্রচণ্ড প্রভাব পরিষ্কাররূপে পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রাণীর যেমন এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি আছে—তাদের দেহমনের গঠন যেমন তাদের ক্ষমতার একটা সীমা নির্দেশ ক'রে দিয়েছে সেই রকম

প্রত্যেকটি একক প্রাণীরও একটা বিশিষ্ট দৈহিক ও মানসিক গঠন আছে এবং এইটেই তার আত্ম-বিকাশের একটা বিশিষ্ট পন্থা নির্দেশ ক'রে রেখেছে—একটা সীমা নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে। যে দুটি কোষ থেকে একটি প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাদের প্রকৃতির ওপর নির্ভর ক'রেছে প্রাণীটির প্রকৃতি। ক্রোমোসোমবাদ কোষের প্রকৃতির ওপর পর্যাপ্ত আলোক সম্পাত ক'রেছে। সম্ভাবনারূপে একটি প্রাণীর মধ্যে যার অস্তিত্ব নেই সহস্র চেষ্টাতেও তার মধ্যে সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলা যায় না। এই জন্যই চলিত কথায় বলে—"গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না", "স্বভাব যায় না ম'লে", "বংশের ধারা যাবে কোথায়" ইত্যাদি, মোটের ওপর বংশধারা এবং পরিবেশ দুটোই প্রাণীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলে না।

সহজাত প্রবৃত্তি

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সঙ্গে ক'রে সে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রেরণা নিয়ে আসে। অর্থাৎ তার দেহমনের এবং বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের প্রতি বিশদভাবে সাড়া দেবার—নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট-রূপ আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। কোন্ পরিবেশে শিশু কিরূপ আচরণ করবে সেটা নির্ভর করছে তার দেহ-মনের স্বাভাবিক সংগঠন ও সংস্থানের ওপর এবং পরিবেশের প্রকৃতি ও প্রভাবের ওপর। শুধু শিশুর নয়, সকল বয়স্ক ব্যক্তি এবং সকল প্রাণীর অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে আছে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না, স্বাভাবিক প্রেরণারাশির প্রচণ্ড আবেগ। তাই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রেরণাগুলিকে কর্মশক্তির উৎসভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার-সামগ্রী পেলে সকল প্রাণীই ভক্ষণ করে। রমণেচ্ছা প্রবল হ'লে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত হয়। অপরের সম্মুখে প্রত্যেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অধিকাংশ প্রাণীই নিঃসঙ্গ-জীবন অপেক্ষা দলগতভাবে জীবন যাপন করতে ভালবাসে। শাবক প্রসবের সময় আসন্ন হ'লে বিহঙ্গী নীড় রচনায় ব্যাপৃত হয়। সম্মুখে নানাবিধ সামগ্রী থাকলে শিশু সেগুলিকে নাড়াচাড়া করে। চারিপাশে যা দেখে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল অনুভব করে। প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অপর শিশুর সঙ্গে মেলামেশা ক'রে খেলা করতে ভালোবাসে। চারিপাশে যারা আছে তাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করে, ইত্যাদি। এই সব আচরণের পশ্চাতে যে সব প্রেরণা আছে সেগুলি স্বাভাবিক, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সব আচরণ আয়ত্ত করতে হয় না। এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত। সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে প্রচুর

মতভেদ আছে। সে সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কোনরূপ আলোচনা করছি না। তবে তাদের সংখ্যা যাই হোক না কেন প্রধানত তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। আত্মগত প্রবৃত্তি ও জাতিগত প্রবৃত্তি। আহার, ক্রীড়া, অনুকরণ প্রশংসাপ্রীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিকাশ, ক্রোধ, ভীতি, প্রেম ইত্যাদির পশ্চাতে যেসব প্রবৃত্তি আছে সেগুলি আত্মগত। মানুষ আত্মরক্ষার জন্য আহার করে। ক্রীড়ার মাধ্যমে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি সম্পাদিত হয়। অনুকরণের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বসবাস করার উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলে। প্রশংসা অহংবোধকে প্রবল করে। আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারাও অহংবোধ পরিতৃপ্ত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা অনেকে উপলব্ধি করতে পারেন না। চারি-পাশে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে রাখলে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অহরহ কিরূপ চেষ্টা করছে তা সহজেই বোঝা যায়। রূপ নিয়ে, আভরণ নিয়ে, সম্পদ নিয়ে সুসভ্য নগরীর রাজপ্রাসাদে কিংবা নিভৃত পল্লীর জলের ঘাটে মেয়েদের মধ্যে প্রায়শঃই যে প্রতিযোগিতা চলে তার মূলে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি। হাটেবাজারে, পূজোর মেলায়, পথে-ঘাটে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় সকলেই যেন নিজেকে দেখাবার জন্য ব্যস্ত। আত্মপ্রকাশের প্রেরণাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি বীজের মধ্যে ফলফুলের যে সম্ভাবনাটি আছে সেটি সব সময়ই আত্মপ্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট। তেমনি প্রত্যেক শিশুর মধ্যে যেসব স্বাভাবিক বিশিষ্টতা নিদ্রিত হয়ে আছে সেগুলিকে সে অহরহ চেষ্টা করছে জাগিয়ে তুলতে। পরিবেশকে যথাসম্ভব পরিবর্তিত করে তাকে আত্মপ্রকাশের অনুকূল করে গড়ে তুলছে। অবশ্যই এই প্রচেষ্টা শিশুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সহজাত প্রেরণাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অন্ধ। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের প্রবৃত্তিগুলি যদিও পরস্পর হতে ভিন্ন তথাপি অনেক সময় তারা একইসঙ্গে পরিতৃপ্ত হয়। ফুল আত্মবিকাশের প্রেরণায় ফুটে ওঠে, কিন্তু তার গন্ধ

তাকে মানুষের কাছে সমাদৃত করে। বিজ্ঞানী আত্মবিকাশের প্রেরণায় সত্য উদ্ঘাটিত করেন, কিন্তু বিশ্ববাসী মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্বে আত্মরক্ষার প্রয়োজন। অনুকরণস্পৃহা, কৌতূহল, ইত্যাদির সাহায্যে শিশু যেমন নিজেকে রক্ষা করে তেমনি ভীতি, রোষ ইত্যাদিও তাকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। ভীতির অনুভূতি বিপদ সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে দেয় এবং বিপদের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে সহায়তা করে। রোষের অনুভূতি তাকে শত্রুকে পরাভূত করে নিজেকে রক্ষা করার প্রেরণা দান করে।

জাতিগত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি, সমাজ-প্রীতি, সহানুভূতি, সন্তান-বাৎসল্য ইত্যাদির নাম করা চলতে পারে। স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক মিলনের পশ্চাতে আছে বংশবৃদ্ধি করার সহজাত প্রেরণা। সন্তান-বাৎসল্যের মূলে আছে বংশরক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। সমাজপ্রীতি, সহানুভূতি ইত্যাদি সমাজ-জীবনকে সহজ ও সুদৃঢ় ক'রে রেখেছে। কিন্তু যদিও আমরা সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে উপর্যুক্ত দুটি ভাগে ভাগ করেছি, তথাপি তাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধিতা নেই। যেমন, স্ত্রীপুরুষের যৌনমিলনের মধ্যে আত্মতৃপ্তি এবং বংশরক্ষা দুই-ই চরিতার্থ হয়।

শিশুর মধ্যে সকলগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই একসঙ্গে প্রকাশিত হয় না। দেহমনের বিভিন্ন পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। যতো দিন না শিশুর হস্তপদ সঞ্চালন করার ক্ষমতা জন্মাচ্ছে ততদিন সে হাঁটতে পারে না। তেমনি যতো দিন পর্যন্ত তার মনের একটা বিশেষ পুষ্টি সম্পাদিত না হচ্ছে ততদিন সে কোন বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে না। তাছাড়া দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এক একটি প্রবৃত্তি এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ যৌনপ্রবৃত্তির নাম করা যেতে পারে। যৌবনে মানুষ যৌন সম্ভোগের মধ্যে যে আনন্দ আস্বাদন করে শিশু তার দেহের অপর কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

উত্তেজনায় অনুরূপ আনন্দের আস্বাদ পায়।

সহজাত প্রবৃত্তিগুলির বিকাশের ওপর শিশুর মানসিক পুষ্টি বহুলাংশে নির্ভর করে। সমাজপ্রীতি শিশুকে আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে প্রবৃত্ত করে। মাতাপিতার প্রতি তার যে অন্ধ আসক্তি ও নির্ভরশীলতা জন্মেছে তা থেকে তাকে ধীরে ধীরে মুক্তি দান করে। সে সঙ্গীদের বুঝতে শেখে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে। মোটের ওপর সমাজে থাকতে হলে যেসব গুণের প্রয়োজন শিশু ক্রমে ক্রমে সেগুলি অর্জন করে। কৌতূহল শিশুকে নিত্য নূতন বস্তু ও বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার মধ্যে জ্ঞান-পিপাসার সঞ্চার করে। মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিক্ষায় সভ্যতায় আজ যে বিস্ময়কর উন্নতিসাধন করেছে তার পশ্চাতে আছে অপরিসীম কৌতূহল। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি শিশুকে প্রতিযোগিতা করতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং নানাবিধ দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন করতে উদ্দীপিত করে। এইভাবে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিই শিশুকে জীবনধারণের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলে।

পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা এবং অনুকরণ ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির কিছু কিছু রূপান্তর ঘটে। ভক্ষণ ক্রিয়া স্বাভাবিক কিন্তু বিভিন্ন জাতের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে আহার প্রস্তুত করে, বিভিন্ন নিয়মে ভক্ষণ করে এবং ক্ষুধা না পেলেও অনেকে নিয়মিত সময়ে আহার করে থাকে। বিহঙ্গী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা বিশেষ সময়ে নীড় রচনা করে, কিন্তু যেসব উপাদান দিয়ে সে বাসাটি তৈরী করে সেগুলো প্রধানত নির্ভর করছে সেই সব সামগ্রীর ওপর যা নাকি তার পরিবেষ্টনীতে পাওয়া যায়।

অনেক মনস্তাত্ত্বিক মানুষের মধ্যে নানাবিধ পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির সন্ধান পেয়েছেন। যেমন সৃষ্টি করার এবং ধ্বংস করার প্রবৃত্তি, পীড়ন করার এবং পীড়িত হবার প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। সকল প্রবৃত্তি সব সময়ই সমাজের কল্যাণে আসে না। যেমন যে শিশুর মধ্যে ধ্বংসপ্রবৃত্তি খুব প্রবল সে চারিপাশে যা-কিছু পায় সব ভেঙে-

চুরে ফেলে, সংগীসাথীদের মারধোর করে এবং পশুপাখি, কীট-পতঙ্গকে নানাভাবে পীড়ন করে। এই প্রবৃত্তিকে যদি উৎসাহিত করা যায়, তা হলে তার ফল হয় অত্যন্ত খারাপ। চরিতার্থতার পথে বাধা পেলে এই সব প্রবৃত্তি স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ ক'রে এমন একটা পথে প্রবাহিত হয় যাতে ক'রে তার চরিতার্থতা আসে অথচ সমাজেরও মঙ্গল সাধিত হয়। প্রেরণান্তর্গত শক্তির এইরূপ ভিন্নমুখী হওয়ার নাম সুচালন বা উদ্গতি। বিশেষজ্ঞগণ সুকৌশলে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সুচালিত করতে পারেন। যার মধ্যে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি প্রবল, যথাসময়ে তাকে যদি যোদ্ধা তৈরী করা যায় তবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনাশ করে সে আনন্দ পাবে অথচ তার ফলে সমাজ হবে উপকৃত। অথবা তাকে যদি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে অস্ত্রোপচারের মধ্যে সে প্রচুর আনন্দের আস্বাদন পাবে অথচ তার দক্ষতায় মানবসমাজ উপকৃত হবে। যে শিশুর কৌতূহল স্বভাবতঃই অবাঞ্ছিত পথে ধাবিত তাকে দক্ষ পরিচালনার সাহায্যে বিভিন্ন বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী ক'রে তোলা সম্ভব। তার ফলে সে তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী হতে পারবে এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারে তার দান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমাদের বিভিন্ন কামনা বাসনার মূলে আছে এক একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যে সকল কামনা বাসনা আমাদের সমাজ ও নীতিবোধের বিরোধী সেগুলিকে যথাযথভাবে অবদমন করতে না পারলে মানসিক সুস্থতার বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই গোড়া থেকেই শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে ক'রে তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে শিশুর বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে নানাভাবে তার শিক্ষাদীক্ষা এবং উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা সম্ভবপর।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ধারা

দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ বড়ো নিবিড়। যে প্রাণীর শারীরিক গঠন যতো জটিল, তার মানসিক শক্তি ততো বিচিত্র, ততো উন্নত। প্রাণীজগতে মানুষের দেহসংগঠন সবচেয়ে বেশী জটিল। তার অনুভূতি গভীর। স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ। মানুষের এই সব মানসিক বৈশিষ্ট্যের কারণ তার দেহগঠনের বিশিষ্টতা। তাছাড়া দেহমনের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রচুর উদাহরণ আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই দেখতে পাই। শরীরের অসুস্থতা মনের প্রফুল্লতাকে নষ্ট করে। মানসিক উত্তেজনা হতে শারীরিক অসুস্থতার উদ্ভব হয়ে থাকে। দেহ ও মনের গভীর সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে মানব-জীবনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ (ক) শৈশব, (খ) বাল্য, (গ) কৈশোর, (ঘ) যৌবন, (ঙ) প্রৌঢ়ত্ব, (চ) বার্ধক্য। জীবনের প্রারম্ভে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়। তারপর ধীরে ধীরে এই বিকাশের গতি মন্থর হয়ে আসে। পুংকোষ স্ত্রীকোষের মিলন মুহূর্ত থেকে শিশুর জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত যে সময় এই সময়ের মধ্যে শিশুর দেহগঠনে যে পরিবর্তন দেখা যায়, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সত্তোর বৎসর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও সে রকম পরিবর্তন সংগঠিত হয় না। পুংকোষ এবং স্ত্রী-কোষ মিলিত হয়ে একটি কোষে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই সম্মিলিত কোষটি লক্ষ লক্ষ কোষে পরিণত হয়ে একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

বাল্য এবং যৌবনে দীর্ঘকাল ধরে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, শৈশবে দু তিন মাসের মধ্যেই সেই পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই সময়ের যে পরিবর্তন তার ওপর বহির্জগতের প্রভাব খুব বেশী

থাকে না। দেহ-কোষের নিজস্ব প্রকৃতিই প্রধানত এই পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন, যে শিশু উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই জন্মায় তার দেহগঠন স্বাভাবিক শিশুর মতো হয় না এবং যে শিশু উপযুক্ত সময়ের পরে জন্মগ্রহণ করে তার দৈহিক গঠন সাধারণ শিশুর দেহগঠন অপেক্ষা উন্নততর।

জন্মের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিশুর সত্তা জননীর সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে। সে স্বতন্ত্রভাবে বায়ুমণ্ডলী হতে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না এবং স্বাধীনভাবে খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতাও তার থাকে না। জন্ম হতে এক বৎসরের মধ্যে শারীরিক গঠন অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। এই সময়ে শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশু যাতে উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত আলোক এবং বাতাস পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত দরকার। জননীদের অবহেলার জন্য এই বয়সে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী।

শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা নিয়ে আসে। এই ক্ষমতা শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয় না। এগুলি স্বাভাবিক ক্ষমতা। ইংরাজীতে এদের বলা হয় রিফ্লেক্স এ্যাকসান। চোখে আলোক লাগলে চোখের পাতা বন্ধ হয়। হাতের মধ্যে কোন বস্তুর স্পর্শ পেলে শিশু মুষ্টিবন্ধ করে। শিশুর মধ্যে কতকগুলি জটিলতর আচরণও দেখা যায়। ক্ষুধার্ত হ'লে শিশু শির সঞ্চালন করে, মনে হয় যেন খাদ্য অন্বেষণ করছে। মুখের মধ্যে কোন বস্তু স্থাপন করলে শিশু লেহন করতে আরম্ভ করে। উচ্চ শব্দে তার সমস্ত দেহ শিহরিত হয়। শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য শিশু ক্রন্দন করে এবং হাই তোলে।

জীবনের প্রথম তিন মাসের মধ্যে দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে কাজ করবার ক্ষমতা লাভ করে এবং রিফ্লেক্সগুলি সুসংবদ্ধ হয়। তিন মাস বয়সে শিশু শক্তভাবে মাথা তুলতে পারে এবং প্রায়ই শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার চক্ষু এবং মস্তক গতিশীল

বস্তুকে অনুসরণ করে। শিশু বস্তুকে মুঠোর মধ্যে পুরে মুখের ভেতর নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে তার আচরণের ওপর পরিবেশের প্রভাব বাড়তে থাকে।

তিন মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে শিশু হস্ত, মস্তক এবং চক্ষুকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করে। যা দেখে তাই হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করে এবং তার নানাবিধ শব্দ ও স্পর্শের অনুভূতি হয়। এই-ভাবে তার ব্যবহার দিন দিন অধিক জটিল এবং সুসম্বন্ধ হতে থাকে। সে শুধু বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় না, কতিপয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কতিপয় বস্তু হ'তে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই সময়ের শেষভাগে শিশু বসতে শেখে এবং আপন গণ্ডীর মধ্যে যে সকল বস্তু থাকে সেগুলিকে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসে। বেশী দূরে যে সকল সামগ্রী থাকে শিশু তার অল্পই লক্ষ্য করে। সন্নিহিত সামগ্রীগুলির মধ্যেই তার কৌতূহল নিবদ্ধ থাকে।

ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে পায়ের ওপর শিশুর অধিকার জন্মে এবং সমগ্র শরীরটাকে সে একসঙ্গে ঘোরাতে ফেরাতে পারে। দূরের সামগ্রী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু এই রকম কতকগুলি সামগ্রীর পাশে যায় এবং কতকগুলির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলে। এই সময়ের শেষের দিকে শিশু হামাগুড়ি দিয়ে এবং হেঁটে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং হাত দিয়ে অনেক জিনিস নাড়াচাড়া করে, ভেঙে-চুরেও ফেলে। কোন জিনিস শিশুর দৃষ্টিপথ হতে অপসারিত হলেও সে তার কথা মনে ক'রে রাখে। মানুষকে বেশী ক'রে লক্ষ্য করে। সহজ কাজ অনুকরণ করে। দু-একটা কথা বলতে শুরু করে। তার চার পাঁচটা দাঁত বেরোয়।

এক বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশুর মনে সমাজের প্রভাব খুব প্রবল হয়। জড়বস্তু অপেক্ষা মানুষ এবং মানুষের আচার আচরণের প্রতি তার দৃষ্টি বেশী করে আকৃষ্ট হয়। শিশুর চারিপাশে যে সকল মানুষ ভিড় ক'রে থাকে শিশু তাদের অনুকরণ করে এবং তাদের সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, অসমর্থনে নিরুৎসাহ হয়ে

পড়ে। এইভাবে শিশু ধীরে ধীরে সমাজের একজন হয়ে দাঁড়ায়। একজনকে কোন কাজ করতে দেখলে শিশু তার অনুকরণ করে। এইভাবে যে অভিজ্ঞতা হয়, সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিশুর মনে অপরের প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার হয়। কেউ কোন কাজ করলে শিশু শুধু সেই কাজ লক্ষ্য করে না, সে কল্পনা করে যেন নিজেই সে কাজটি করছে। এই কাজ করার যে অভিজ্ঞতা শিশু পূর্বে লাভ করেছে, সেই অভিজ্ঞতা পুনরায় তার মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আনন্দিত, রুষ্ট অথবা ভীত ক'রে তোলে। শিশু তখনো নিজেকে অন্য লোকের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে ভাবতে পারে না। অন্য লোকের কার্য-কলাপকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে। অন্যলোকের আকাঙ্ক্ষা, প্রক্ষোভ এবং কল্পনাকে নিজের মধ্যে অনুভব করে। এই ভাবে তার মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার হয়ে থাকে। শিশুর কথাবার্তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বিশ্ব-জগতের অধিকাংশ সামগ্রীকেই সে প্রাণবন্ত মনে করে। অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে নিজের মনের অনুভূতি আবেগ ইত্যাদি অভিজ্ঞতাগুলি আরোপ ক'রে থাকে। শিশু শুধু অপরকে অনুকরণ ক'রে তার মানসিক বিকাশকে দ্রুততর করে তাই নয়, সে তার নিজের কাজে যোগদান করার জন্য অন্য সকলকে প্রণোদিত ক'রে থাকে। এইভাবে শিশুর মনের সঙ্গে অন্য লোকের মনের একটা নিবিড় আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার সমাজ চেতনা বিকশিত হয়ে ওঠে। এই সময়ে শিশুর জীবনে আর একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। কণ্ঠস্বরের ওপর তার অধিকার জন্মে। সে ধীরে ধীরে ভাষা শিক্ষা করে। ভাষার মাধ্যমে শিশু বর্তমান থেকে অতীতের অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ ক'রতে পারে। কোন বস্তু, কাজ বা ঘটনার সঙ্গে কোন শব্দের (নাম) বার বার সংযোগ স্থাপিত হলে—অর্থাৎ শিশু কোন একটা বস্তু যখন দেখছে তখন তার মাতাপিতা বা সঙ্গীসাথীরা যখন বার বার বস্তুটার নাম উচ্চারণ করেন তখন কেবলমাত্র শব্দটিই শিশুকে সেই বস্তুটির (কাজ অথবা ঘটনার) কথা মনে করিয়ে দেয়। এইভাবে শিশু

বর্তমানের গণ্ডী ছাড়িয়ে অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে অভিযান করতে পারে। শব্দাবলীর সাহায্যে শিশু সুসংবন্ধরূপে চিন্তা করবার ক্ষমতা লাভ করে। তাছাড়া ভাষার সাহায্যে শিশুর সমাজ-জীবন সহজ হয়ে ওঠে। ভাষার সাহায্যে সে নিজের মনকে অপরের কাছে উদ্ঘাটিত ক'রে দিতে পারে এবং অপরের কথা শুনে তার মনের পরিচয় লাভ করে। তিন বৎসরের পূর্বেই শিশু কল্পনা ক'রতে শেখে। প্রথম প্রথম তার মনে কল্পনার উন্মেষ ক'রতে হলে শব্দ ছাড়া বস্তু এবং অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন হয়। তারপর বস্তু ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্য ব্যতীতও সে কল্পনা করতে পারে। দুই বৎসরের মধ্যেই শিশু প্রায় কয়েকশত থেকে দুই সহস্র শব্দ আয়ত্ত করে। এই সকল শব্দ ব্যবহারের ফলে শিশু তার আপন অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে। এর পূর্বে শিশু তার নিজের দেহটাকে অন্যান্য অনেক বস্তুর মধ্যে অন্যতমরূপেই জানতো। কিন্তু তার দেহটাকে শিশু শুধু চক্ষু দিয়ে দেখে না। নিজের দেহ সঞ্চালিত হলে অথবা কেহ তাকে স্পর্শ ক'রলে সে এমন অনেক বিচিত্র অনুভূতি লাভ করে, যে সকল অনুভূতি অন্যান্য বস্তু হতে সে পায় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতির জন্য তার শরীরের অভ্যন্তরে অবিরাম যে সকল অনুভূতির সঞ্চার হয়, সেগুলি পূর্বোক্ত অনুভূতি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিসমূহের পটভূমি রচনা করে। শব্দের সাহায্যে শিশু পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ ক'রে আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। তার মধ্যে 'আমিত্ব' বোধের উদ্ভব হয়। দু-বছরের শিশুদের মধ্যে একটা "ঋণাত্মক" মনোভাব দেখা যায়—অর্থাৎ তাকে কোন কিছু ক'রতে বললে প্রায়ই সে "না" বলে বসে। কিন্তু এতে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। এইরূপ মনোভাব শিশুর বিকাশের একটি অতি স্বাভাবিক স্তর মাত্র। তিন বছরের শিশুর মধ্যে অতিশয় কর্ম-চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। হাত ও পায়ের ব্যবহার রীতিমত বেড়ে যায়। শিশু চারিপাশে দৌড়াদৌড়ি,

লাফালাফি করে। জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে, ভেঙেচুরে ভারি আনন্দ পায়।

তিন থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে শিশুর জগতের সীমানা বর্ধিত হয়। নূতন নূতন লোকের সংস্পর্শ তার মনে নব নব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সময় অন্যের প্রতি শিশুর এবং শিশুর প্রতি অন্যের মনোভাবে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। অন্য সকলে শিশুর মনে প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি বিশ্বাস এবং বাধ্যতার সঞ্চার করতে চায়, কিন্তু শিশু এই সময় তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এতো বেশী সতর্ক থাকে যে, স্বাধীনভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সে অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে এবং অনুকরণ স্পৃহা ত্যাগ করে। অপরের সংগে তার নিজের এই সংঘাতের ফলে শিশুর মনে বিদ্রোহী ভাব দেখা যায়। কারো উপদেশ অনুযায়ী সে চলতে চায় না এবং সাধারণত যে কাজ তাকে ক'রতে বলা হয় সে তার বিপরীতটাই ক'রে থাকে। এই সময়ে শিশু নিজেকে হাতি, ঘোড়া, ভালুক প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার কল্পনা ক'রে খেলার ভেতর দিয়ে নিজের নবোদ্গত ব্যক্তিত্বের ওপর নানারূপ পরীক্ষা ক'রে থাকে। এই সব খেলা শিশুর কল্পনাশক্তিকে প্রখর এবং ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলে। এই সব অভিনয়ের ভেতর দিয়ে সে সহজেই বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য উপলব্ধি করতে শেখে। আমরা বলেছি তিন বছরের শিশুর জীবন অতিশয় কর্ম-চঞ্চল। তাকে যদি 'কর্মবীর' আখ্যা দেওয়া যায়, তবে চার বছরের শিশুকে 'দার্শনিক' বলতে হবে। কারণ এই সময়ে সব কিছু সম্বন্ধেই তার অপরিসীম কৌতূহল দেখা যায়। কেন? কী ক'রে? ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন চার বছরের শিশু প্রায়ই ব্যবহার করে। এসব থেকে তার জ্ঞান পিপাসার গভীরতা, তার মানসিক বিকাশের দ্রুততা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু তার এই দার্শনিক মনোভাব তাকে অলস ক'রে ফেলে না। তার জীবনে কাজ এবং কল্পনা দুটোই সমানভাবে পা ফেলে চলে। ছুটোছুটি, লাফালাফি, দাপাদাপির অন্ত থাকে না এ সময়েও। এই সময়টাতে শিশু নানা-

রকম রূপকথার গল্প, ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদি শুনতে ভারি ভালোবাসে। কারণ এগুলো তার কল্পনাকে সম্পদশালিনী ক'রে তোলে। অনেক সময় কল্পনাপ্রবণ শিশুরা কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারে না এবং এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলে, যেগুলো বাস্তব জগতে না ঘটে তার কল্পনা জগতেই ঘটে। কল্পনার বস্তু বাস্তব বস্তুর মতো তাদের মানসচক্ষে সজীব হয়ে ওঠে। মাতাপিতা অনেক সময় এদের ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না এবং মিথ্যাচারী মনে ক'রে তাদের নানাভাবে তিরস্কৃত ক'রে থাকেন। তাঁদের এই রকম আচরণ কিন্তু শিশুর কোমল মনে গভীর আবেগের সঞ্চার ক'রে থাকে। এই সব শিশুকে তিরস্কার না ক'রে কল্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা তাদের ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের এই বিশেষ শক্তিটাকে তাদের শিক্ষার কাজে লাগানো দরকার। যে সকল শিশু কল্পনার মধ্যে অতিরিক্ত আনন্দ আস্বাদন করে তারা পরবর্তী জীবনে সামাজিক হতে পারে না। নিজেদের সুখ দুঃখ ব্যর্থতা সফলতা নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। স্বাধীনতা না পেলে শিশুর মধ্যে কল্পনাবিলাসিতা এবং বিদ্রোহী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। অত্যধিক স্নেহ অথবা কঠোরতা দুইই শিশুকে মানুষ করার প্রতিবন্ধক। কল্পনা ছেড়ে শিশু যাতে বাস্তব জগতে নেমে আসে সে জন্য তাকে অনেক সংগীসাথীর সংগে খেলা-ধূলা এবং কাজকর্মের সুযোগ দেওয়া দরকার।

ছয় বৎসরের সাধারণ শিশুর উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি এবং ওজন পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড। এই সময়ে শিশু পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে। তার ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটে। উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির গতি মন্থর হয়ে আসে। অংগ প্রত্যংগ সর্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টিলাভ করে। মস্তিষ্কের অত্যন্ত অল্প পুষ্টি সাধিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন এবং পরিপাক ক্রিয়ার খুব কম পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ের প্রারম্ভে শিশু পরিবারের সীমা ছেড়ে বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে এবং বন্ধু বান্ধবদের দলে আনাগোনা করে। সে বহির্জীবনের স্বাদ

আস্বাদন করে। ইতিহাস, ভূগোল, চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সে অন্য দেশ, অন্য জাতি, অন্যান্য প্রাণী প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং তাদের সম্বন্ধে কৌতূলী হয়ে ওঠে।

কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেহ মনে পরিবর্তনের প্লাবন নামে। শরীরের কতকগুলি গ্রন্থি পরিপুষ্ট হয় এবং তাদের থেকে যে রস ক্ষরিত হয় সেই রস শারীরিক বৃদ্ধি, সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মেয়েদের এগারো হতে তেরো এবং ছেলেদের তেরো থেকে পনেরো বৎসরের মধ্যে দৈহিক উচ্চতার গতি পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ দ্রুততর হয়। সেই অনুপাতে ওজনের বৃদ্ধি হয়। বালিকারা যুবতী এবং বালকেরা পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত হয়। দৈহিক পরিবর্তনের এই স্তরে মনেরও প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। এই সময়ের প্রথমভাগে সাধারণত মেয়েদের প্রতি মেয়েদের এবং ছেলেদের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তারা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে। তারপর এই আকর্ষণের গতি পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে দীর্ঘকাল ধরে ছেলে এবং মেয়েদের পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ সেটা স্থায়ী হয় না। এর ফলে পরবর্তী কালে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হতে পারে না। সমশ্রেণীর মধ্যেই তাদের ভালোবাসা নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং খুব সতর্কতা সহকারে ছেলেমেয়েদের এই সময় যথাসম্ভব মেলামেশা করতে দেওয়া দরকার। এই সময়ে সুখ, দুঃখ, বেদনা, সহানুভূতি, ঘৃণা, ভালোবাসা প্রভৃতির অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল এবং গভীর হয়। সাধারণত মাতাপিতা এবং অন্যান্য গুরুজনেরা এই সময় তরুণ তরুণীদের নানারূপ পরামর্শ এবং উপদেশ দান করেন এবং তারা যাতে তাঁদের কথামতো চলে সেইরূপ দাবি করে থাকেন। এর ফলে তরুণ তরুণীদের মনে বিদ্রোহ জাগে। তারা মাতাপিতা এবং গুরু-

জনদের প্রভাব হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করতে চায় এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে প্রয়াস পায়। এই সময় তাদের মনে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। নানাবিধ কাজে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং এইভাবে তাদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে তাদের মধ্যে ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে হবে। শাসন করলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। বন্ধুর মতো আচরণ ক'রতে হবে তরুণ তরুণীদের সঙ্গে।

শিশুর দেহ এবং মন জন্মমুহূর্ত হতে সুরু করে ধীরে ধীরে কীভাবে বিকশিত, পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে—কীভাবে তার দেহের বৃদ্ধি এবং মনের বিস্তৃতি ঘটে অনুধাবন করলে সেটা সহজেই বোঝা যায়। সাধারণত জন্মকাল থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুর দৈহিক ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং সে প্রথমে মাথা তুলতে পারে, তারপর বসতে এবং তারপর দাঁড়াতে শেখে। এক থেকে দু' বছরের মধ্যে শিশু অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তার হাতগুলি ব্যবহার করতে পারে। সোজা হয়ে হাঁটতে শেখে। দৌড় ঝাঁপ করে। বিনা আয়াসে কথা বলতে পারে এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে মনের আনন্দে খেলা করবার ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণত সকল শিশুরই শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের ধারাটি যদিও এই রকম তথাপি একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রভেদ থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেটা হলো তাদের বিকাশের গতি। কেউ হয়তো বারো মাসে হাঁটতে শেখে, কারও বা ষোল মাস লাগে হাঁটতে। কেউ তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে, কারও বা কথা বলতে অনেক দেরি হয়। যদি দেখা যায় অপর একটি শিশু তেরো মাসে হাঁটতে সুরু ক'রেছে অথচ তার সমবয়সী শিশুটি তখনও ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছে না তা হ'লে এ দেখে দ্বিতীয় শিশুটির মাতাপিতার শঙ্কিত হবার কিছু কারণ নেই। তার কারণ যদিও জড়বুদ্ধি শিশুরা অনেক দেরিতে এবং খুব মন্থর গতিতে কথা বলতে এবং হাঁটতে শেখে তথাপি এও দেখা গেছে যে, অনেক বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী মানুষও অনেক দেরিতে

চলতে এবং বলতে শিখেছিলেন। মাতাপিতা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে, শিশু একটা সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ ক'রে বেড়ে উঠছে কী না, শিশু হাঁটার আগে বসতে পারছে কী না, পা দুটোকে আয়ত্ত করবার আগে হাতদুটোকে যথারীতি ব্যবহার করছে কী না এই বিষয়গুলিই তাঁদের অনুধাবনীয়। শিশুর এই সব কার্যকলাপের ওপর তাঁদের খুব বেশী হাত নেই—এগুলি প্রধানত নির্ভর করছে তার শরীরের পরিপুষ্টির ওপর। অবশ্য এই পরিপুষ্টিকে তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে বিকশিত হবার সুযোগ দান করতে পারেন। ক্ষুদ্র শিশুটির ওপর ভারি-ভারি একরাশ জামা কাপড় না চাপিয়ে ,তাকে যদি প্রত্যেক দিন বেশ কিছুক্ষণ খালি গায়ে রাখা যায়, তবে সে ইচ্ছা মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করবার সুযোগ পাবে। শিশুর চারিপাশে নানা রকম দ্রব্য-সামগ্রী রাখলে সেগুলি নাড়াচাড়া ক'রে সে বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং তার স্নায়ুতন্ত্রী ও পেশীগুলি পরিপুষ্ট হবে। মাতাপিতা যদি বেশ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তা হলে সেও সহজে কথা বলতে শিখবে। তাকে নিয়ে যদি ঘরময় ঘুরে বেড়ানো হয় তবে চলাফেরার ওপর তার সহজ অধিকার জন্মাবে এবং বিচিত্র বস্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তার মানসিক বিকাশকে দ্রুততর ক'রে তুলবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বলবার কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শিশুর পরিপুষ্টি ও বিকাশ যেমন একই গতিতে সম্পন্ন হয় না তেমনি আবার একটি শিশুরই জীবনে বিকাশ ও পুষ্টির গতিটি সমান তালে চলে না। যেমন এক বছরের মধ্যে তার ওজন ও উচ্চতা অতিশয় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তারপরই কয়েক বছর ধ'রে এই গতি মন্থর হয়ে আসে। অতএব কোন এক সময়ে শিশুর ওজন বা উচ্চতা বাড়ছে না দেখে শঙ্কান্বিত হবার খুব বেশী কারণ নেই—অন্য কোন দিকে (যেমন খাদ্যসংক্রান্ত বিষয়ে) যদি ত্রুটি না থাকে তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা চলে।

শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ

মানব জীবনে ভাষার প্রভাব অপরিমেয়। আমাদের মনের গহনে যে সকল বিচিত্র ধরনের চিন্তা ধারণার উদয় হয় ভাষার মাধ্যমে আমরা সেই সকল চিন্তা ধারণা অন্যের কাছে প্রকাশ করি। আমরা যে সব অভাব নিত্য অনুভব করে থাকি সেগুলিকে ভাষার সাহায্যে অন্যের গোচরভূত করি। শিলালিপি, গ্রন্থমালা, অনুশাসন ইত্যাদির মধ্যে যুগযুগান্তের যে সকল কল্পনা ভাষার লেখনে বন্দী হয়ে আছে সে সকল পাঠ ক'রে আমরা আমাদের জ্ঞান-ভান্ডার পূর্ণ ক'রে থাকি। ভাষার সাহায্যে সময়ের সীমা অতিক্রম ক'রে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারি। ভাষার মাধ্যমে নিজেকে যেমন অন্যের সম্মুখে প্রসারিত করে দিই তেমনি আবার অন্যকেও নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করি। আত্মপ্রকাশ, আত্মরক্ষা, কৌতূহল, কল্পনা, সমবেদনা প্রভৃতি সহজ ও অর্জিত প্রেরণাগুলি ভাষার সাহায্যে প্রভূত পরিমাণে পরিতৃপ্তি লাভ ক'রে থাকে। ভাষার প্রভাব আমাদের জীবনে সত্য সত্যই বিস্ময়কর।

ভাষা যে শুধু আমাদের কতকগুলি প্রেরণাকে তৃপ্ত করে তাই নয়, আমাদের ব্যক্তিত্বও ভাষা প্রয়োগের রীতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। ভালো বক্তা শ্রোতার মনে গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন। যিনি ভালো গল্প বলতে পারেন তাঁর আকর্ষণী শক্তি প্রবল হয়। তাঁর চারপাশে মুগ্ধ মানবের ভিড় জমে। গভীর কণ্ঠস্বর ব্যক্তিত্বকে গাম্ভীর্যময় ক'রে তোলে, শ্রোতার ওপর যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করে । অনেক সময় কণ্ঠস্বরের বিকার বক্তাকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে। তোতলামি এই রকম একটি স্বর-বিকার। যাঁরা তোতলা তাঁদের জীবনের খাতায় নিশ্চয়ই এই ধরনের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। কথার শক্তি অতি

প্রচণ্ড, অত্যন্ত বিস্ময়কর। শুধু কথার সাহায্যে অনেক কঠিন পীড়ার চিকিৎসা সম্ভব হয়। উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে কথার সাহায্যে বক্তা শ্রোতার মনে নূতন ধারণা, নূতন বিশ্বাস সৃষ্টি করেন। এই ধারণা, এই বিশ্বাস শ্রোতার 'মরমে', তার মনের 'গভীরে' দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এইরূপে বিশ্বাস উৎপাদনের নাম 'অভিভাবন'। রুগ্ন ব্যক্তির মনে আরোগ্যের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি ক'রে বহু মনোবিজ্ঞানী আশ্চর্যভাবে অনেক রোগের উপশম করেছেন। প্রাচীন ভারতে মুনিঋষিদের বরবাক্য অথবা অভিশাপবাণী আশ্চর্যভাবে সফল হয়ে উঠতো। আমাদের বিশ্বাস এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর পশ্চাতে থাকতো 'অভিভাবন'। কণ্ঠস্বরের প্রভাবে একজন আর একজনের ওপর নিদ্রার মায়াও বিস্তার করতে পারে। এই মায়া-নিদ্রার মোহে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির নির্দেশে অনেক অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পন্ন ক'রে দর্শকদের বিমূঢ় ক'রে তোলে।

কথন, পঠন, লেখন ভাষার বিভিন্ন রূপান্তর। কবিতা, কাহিনী, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত ইত্যাদি যে সব চারুকলা আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের মনে অফুরন্ত আনন্দের সঞ্চার করে সেগুলি সব কথারই সৃষ্টি, কণ্ঠস্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ।

আমাদের স্বরযন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বরতন্ত্রী আছে। ফুসফুস হতে বাতাস নির্গত হয়ে যখন স্বরযন্ত্রের ভেতর দিয়ে খরগতিতে প্রবাহিত হয় তখন এই স্বরতন্ত্রীগুলিতে শিহরণ জাগে, তন্ত্রীগুলি হিল্লোলিত হয়। যে সব পেশী এই তন্ত্রীগুলিকে চালিত করে সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কম্পনের তারতম্য ঘটে। বীণার তারগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন সুরে সাধা থাকে তেমনি আমাদের নাসারন্ধ্রে এবং মুখগহ্বরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রী আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ সুরে সাধা। বিবিধ প্রকার কম্পনের সংমিশ্রণ থেকে তারা এক একটি কম্পন সঞ্চয়ন ক'রে নেয় এবং একটা বিশিষ্ট সুরে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

ওষ্ঠ এবং জিহ্বার সাহায্যে এই সব ধ্বনিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকি।

জন্ম-ক্রন্দনঃ সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনই ব্যক্তি-জীবনে স্বর-যন্ত্রের সর্বপ্রথম ব্যবহার। অনেক তথাকথিত দার্শনিক মনে করেন, জন্ম-ক্রন্দনের পশ্চাতে গভীর তথ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেউ কেউ বলেন, শিশু এই পাপময় পৃথিবীর সংস্পর্শ লাভ ক'রে মনের দুঃখে অনুশোচনায় কেঁদে ওঠে। এইরূপ কল্পনার ভিত্তি কোন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জন্ম-ক্রন্দন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জন্মগত প্রতিক্রিয়া। সংকীর্ণ অন্ধকার মাতৃগর্ভ হতে যখন শিশু বিশাল পৃথিবীতে প্রচুর আলোক পর্যাপ্ত বাতাসের মধ্যে আগমন করে তখন তার সারা দেহে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত অক্সিজেন তার রক্তসঞ্চালনকে দ্রুততর ক'রে দেয়। বায়ুস্রোত খর গতিতে তার স্বরযন্ত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই শিশু কেঁদে ওঠে। এই ক্রন্দনের পশ্চাতে কোন রকম দার্শনিক তথ্যের অস্তিত্ব একেবারেই নেই।

জীবন প্রভাতের বিচিত্র স্বরধ্বনিঃ শিশু বিচিত্র স্বরধ্বনির ভেতর দিয়ে তার বিভিন্ন অনুভূতিকে প্রকাশিত করে। অস্বস্তি বোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের ভেতর। প্রক্ষোভ এবং অনুভূতি প্রকাশের এই রীতি শুধু মানবশিশুর মধ্যে আবদ্ধ নয়, অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও এই রীতির প্রচলন দেখা যায়। প্রাণীজগতে 'যন্ত্রণাধ্বনি', 'সংকেতধ্বনি', 'আনন্দধ্বনি' ইত্যাদি বিভিন্ন ধ্বনির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মধুবাহী মৌমাছির গুঞ্জন আর মধুসন্ধানী মৌমাছির গুঞ্জনের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। স্বরবৈচিত্র্যের সাহায্যে অনুভূতি ও প্রক্ষোভ প্রকাশের নাম 'প্রক্ষোভভাষণ'। মানব শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভ ভাষণের মধ্যে কোন রকম গুণগত পার্থক্য নাই। পার্থক্য শুধু মাত্রার বা গভীরতার। শিশু শুধু স্বরবৈচিত্র্যের সাহায্যে তার প্রক্ষোভ প্রকাশ করে তাই নয়, অন্যলোকের স্বর অনুধাবন ক'রে সেই

স্বরে বিভিন্ন প্রক্ষোভের সংকেত হৃদয়ঙ্গম করে। কয়েক মাসের শিশুকে উপযুক্ত কণ্ঠস্বরের সাহায্যে শান্ত, উত্তেজিত, উৎসাহিত অথবা নিরুৎসাহিত করা সম্ভব।

√ শৈশব-কাকলিঃ চার মাস থেকে নয় মাসের মধ্যে শিশু আবোল-তাবোল বকতে সুরু করে। এই সব আবোল-তাবোল বকার নাম শৈশব-কাকলি। ভাষার মধ্যে যে সকল শব্দ আছে শিশু তার প্রায় সকলগুলি শব্দই এই সময়ে উচ্চারণ করতে পারে। শিশু প্রথমে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে তারপর ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে শেখে। স্বরধ্বনির মধ্যে 'অ' ধ্বনি সবচেয়ে আগে উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে শিশু প্রথমে 'ব', তারপর প, ম, গ, ক এবং সবচেয়ে শেষে 'র' এবং 'ল' এর উচ্চারণ আয়ত্ত করে। অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। শিশু যা শোনে তাই অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করবার আগে শিশু শব্দোচ্চারণের সুর, ঢঙ এবং ছন্দ অনুকরণ করে। শিশু প্রথমে শব্দোচ্চারণের সমষ্টি লক্ষ্য করে, তারপর শব্দান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শৈশব-কাকলিতে পুনরুক্তি লক্ষিত হয় অর্থাৎ শিশু একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করে। যেমন—মা-মা, দা-দা, বা-বা ইত্যাদি। এইসব পুনরুক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন। 'মা-মা'র অর্থ সত্যি সত্যি মামা নয়, 'মা' শব্দটার পুনরাবৃত্তি মাত্র। মাতাপিতা অনেক ক্ষেত্রে শিশুর এই সব পুনরুক্তিকে অর্থময় শব্দ বলে ভুল ক'রে থাকেন।

শব্দোচ্চারণঃ শিশু শব্দ উচ্চারণ এবং শব্দ প্রয়োগ করবার আগে অন্যের কথা বুঝতে পারে। প্রথম উচ্চারিত শব্দটি সাধারণত কোন একটি অতি পরিচিত বস্তুর নাম। কোন একটি বস্তু যখন শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে তখন উক্ত বস্তুটির নাম অর্থাৎ একটি স্বতন্ত্র শব্দ কয়েকবার উচ্চারিত হলে উক্ত বস্তু এবং উক্ত শব্দের মধ্যে একটা সুগভীর সংযোগ সংস্থাপিত হয়। এর ফলে বস্তুটি শব্দটিকে এবং শব্দটি বস্তুটিকে শিশুর স্মরণ পথে নিয়ে আসে। যাঁদের বাড়ি টিয়া

কিংবা ময়না আছে তাঁরা এই মজার ব্যাপারটা সহজেই লক্ষ্য করতে পারবেন। ও বাড়ির ভৃত্য গোপাল যখন এবাড়ি এল তখন গিন্নীমা বললেন—'কি গোপাল?' পাখি গোপালকে দেখলে, গিন্নীমার কথা-গুলোও শুনলো। কয়েকবার এই রকম হবার পর দেখা গেলো গোপালকে দেখলেই পাখি বলে—'কি গোপাল?' ঠিক এমনিভাবে শিশু বিড়ালকে 'মিউ-মিউ' এবং গরুকে হাম্মা' বলতে শেখে। সে যখন বিড়াল নিয়ে খেলা করে তখন বিড়ালটা ডেকে ওঠে 'মিউ-মিউ'। বিড়ালের চেহারা আর বিড়ালের ডাক এই দুয়ের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়। শিশু বিড়াল দেখলেই বলে 'মিউ-মিউ'। গোরুকে বলতে শেখে 'হাম্মা'। জনৈক পিতা তাঁর শিশু পুত্রকে 'কান' কথাটা বেশ অদ্ভুতভাবে শিখিয়েছিলেন। তিনি শিশুটির একটি কান টেনে বললেন—'কান'। শিশুটি মজা পেলো। তারপর শিশুটির আর একটি কান টেনে বললেন—'কান'। এবারও শিশুটি বেশ আমোদ উপভোগ করলো। তখন তিনি শিশুটির একটি হাত তার একটি কানের ওপর রেখে বললেন—'কান'। শিশুটি তৎক্ষণাৎ 'কান' কথাটি শিখে ফেললো এবং কান বস্তুটিকে চিনতে পারলো।

অভিনব শব্দসংকলন ঃ শিশু অনেক সময় অজ্ঞাতভাবে এক একটি সম্পূর্ণ নূতন অত্যাশ্চর্য নাম আবিষ্কার করে। একজন ভদ্রলোক তাঁর বাল্যের অনুরূপ দুটি অভিজ্ঞতার কথা লেখককে জানিয়েছেন। শৈশবে একটা বিশেষ বৈদ্যুতিক পাখাকে ঘুরতে দেখলে তাঁর মনে হ'তো পাখাটা যেন—'কপিন্ ফিফ্‌টিন'-কপিন্ ফিফ্‌টিন্'। এই কথাটাকে কোন ইংরাজী কথা বলে মনে করার কোন হেতু নেই কারণ এই কথাটা যে সময়ে তাঁর মনে উদিত হয়েছিল তখনও তিনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন নাই। তাঁর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথা এখন বলি। তিনি খুব বড়এলাচ খেতে ভালবাসতেন। চিবোতে চিবোতে যখন তাঁর খুব ঝাল লাগতো তখনকার সেই অবস্থাকে তাঁর বড়ো "ণী" মনে হতো। ভাষার এই সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন রকম গভীর গবেষণা এ পর্যন্ত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস এ সব ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যক্তি ও

জাতির জীবনে ভাষাবিকাশের যে ধারা তার ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত ক'রবে।

শব্দসঞ্চালন ঃ অনেক সময় দেখা যায় শিশু একই নামে একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে অভিহিত করছে। এই সময় শিশু সকল বয়স্ক পুরুষকে 'বাবা,' বয়স্কা মহিলাকে 'মা' এবং লম্বা বস্তুকে 'লাঠি' সম্বোধন বা বর্ণনা করে। শিশু এই সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য ক'রে তাদের সামঞ্জস্যটাই বেশী ক'রে লক্ষ্য ক'রে থাকে।

শব্দ-সংযোজন ঃ অনেক সময় দুটি পুরাতন শব্দ মিশিয়ে শিশু একটি নূতন শব্দ সৃজন করে। যেমন শিশু হয়তো 'সূর্যাস্ত' কথাটা জানে না। অথচ সূর্যকে 'সুজজি' ব'লে জানে এবং লুকোচুরি খেলবার সময় কেউ দৃষ্টি পথের বাইরে গেলে 'কু-কু' শব্দ করে এটাও সে লক্ষ্য করেছে। তাই সূর্যাস্তকে (সূর্য যখন দৃষ্টিপথের বাইরে যায়) সে হয়তো একটা অভিনব নাম দিলে—'সুজজি-কু-কু'। এই নামকরণের পশ্চাতে যে অপূর্ব মনন শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সেটাকে অনেকেই অনুধাবন করবার চেষ্টা করেন না বরং শিশুর কথাটাকে অদ্ভুত ব'লে হেসে উড়িয়ে দেন। ফলে শিশুর মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রেরণাটি প্রতিহত হয়। সে কী বলতে চায় সেটা বুঝতে হবে এবং তাকে উপহাস না ক'রে বড়োদের অভিধানে তার বক্তব্য বিষয়টাকে কী বলে সেটা তাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

অর্থবোধ ঃ প্রথম যখন একটি স্বতন্ত্র বস্তুর সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র শব্দের সংযোগ স্থাপিত হয় তখন শিশুর কাছে বস্তুটির 'আকার' ছাড়া কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। কিন্তু দিনে দিনে শিশুর অভিজ্ঞতা যতো বাড়তে থাকে, সে যতো বস্তুটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে শেখে ততোই বস্তুটি তার কাছে অধিকতর অর্থময় হয়ে ওঠে। শিশু ধীরে ধীরে শেখে কমলালেবু একটি বিশেষ রঙের বিশেষ আকারের ফল, খেতে অম্ল মধুর তার গন্ধ আমোদিত করে। সুতরাং কমলালেবু কথাটা শিশুর মনে নানারকম ভাবের উদয় করতে পারে। শিশু যখন

সবে মাত্র একটা কি দুটো কথা বলতে শিখেছে তখন সে একটি মাত্র ক্ষুদ্র শব্দের সাহায্যে তার মনের একটা পরিপূর্ণ অভিপ্রায়কে প্রকাশ করতে পারে। 'কমলালেবু' কথাটা উচ্চারণ ক'রে শিশু হয়তো বোঝাতে চায়—'ওই যে একটা কমলালেবু' 'আমাকে একটা কমলালেবু দাও' অথবা 'আমি কমলালেবু খাবো' ইত্যাদি। শিশুর সঙ্গে যাঁরা অধিকাংশ সময় যাপন করেন তাঁরাই তার অঙ্গভঙ্গি, বলার ঢঙ ইত্যাদি দেখে বলতে পারেন যে একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ কথা দিয়ে শিশু তার মনের কী ভাবটি প্রকাশ করতে চাইছে। শিশুর ইচ্ছাগুলিকে যথাসম্ভব সমর্থন করলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্ম-বিশ্বাস জেগে ওঠে। এর ফলে তার মানসিক বিকাশ উন্নততর ও সুন্দরতর হয়ে ওঠে। কিন্তু ইচ্ছেগুলো কী জানতে হলে তার কথার অর্থ যথাযথভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে এবং তার জন্য শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার খুব বেশী করে মেলামেশার প্রয়োজন। যে একটি মাত্র শব্দ বা পদ দিয়ে শিশু একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'একপদবাক্য'।

পদ ঃ শিশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম বিশেষ্য পদের আধিক্য দেখা যায় কিন্তু আমরা এইমাত্র বলেছি বড়োদের ব্যাকরণ মতে এগুলি বিশেষ্য পদ হলেও শিশুর অভিধানে এগুলি অনেক সময় ক্রিয়ার মতো কাজ করে, কারণ একটিমাত্র বিশেষ পদ শিশুর একটি পূর্ণ অভিপ্রায়কে প্রকাশ করতে সক্ষম। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ্য পদের অনুপাত কমতে থাকে এবং ক্রিয়াপদের অনুপাতে বেড়ে চলে শৈশব-কথনে বিস্ময়সূচক শব্দেরও ছড়াছড়ি দেখা যায়। বিশেষণ, সর্বনাম ইত্যাদি অন্যান্য পদ ধীরে ধীরে শিশুর কথনে আত্মপ্রকাশ করে। সবচেয়ে পরে 'ও, এবং, অথবা' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়ের আবির্ভাব ঘটে। দুবছর বয়সে শিশুর কথোপথনে বিশেষ্য পদের যে অনুপাত সমগ্র ভাষার মধ্যে বিশেষ্যপদের অনুপাত ঠিক সেই রকম কিন্তু শৈশব-কথনে ক্রিয়ার অনুপাত সমগ্র ভাষায় ক্রিয়ার অনুপাত হতে প্রায় দ্বিগুণ বেশী। এ থেকে বোঝা যায় শিশু বস্তুর চেয়ে কার্য

কলাপ সম্বন্ধে অধিকতর কৌতূহলী।

দ্বি-পদ ও বহু-পদ বাক্য ঃ একপদ বাক্য ব্যবহার করার কিছুকাল পর শিশু দ্বি-পদ বাক্য ব্যবহার করে। একটি বিশেষ্য পদ এবং একটি ক্রিয়াপদ (যেমন, 'আমি খাই', 'বাবা যায়', ইত্যাদি) দিয়ে এই দ্বিপদ বাক্য সংঘটিত হয়। ধীরে ধীরে শিশু বহুপদ বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। বাক্য রচনার এই উৎকর্ষের মূলে আছে শিশু মনের পরিপুষ্টি।

ভঙ্গিমা-ভাষণ ঃ প্রথম প্রথম শিশু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার ক'রে থাকে। কথার অর্থ উপলব্ধি করার আগে শিশু অঙ্গভঙ্গির ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারে এবং শব্দ ব্যবহার করবার আগেই অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে। ধীরে ধীরে সে যখন বুঝতে পারে যে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং শব্দোচ্চারণ অপেক্ষা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহারে বেশী শক্তির ক্ষয় হয়, তখন সে অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার ত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে শব্দ প্রয়োগ করতে শেখে।

ভাষণ প্রকৃতি ঃ শৈশব কথন প্রথমে আত্মকেন্দ্রিক থাকে তারপর ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে ওঠে। আত্মকেন্দ্রিক ভাষণ তিন প্রকারের —(ক) পুনরুক্তি—একই শব্দ বা পদের পুনরাবৃত্তি, (খ) স্বগতোক্তি—নিঃসঙ্গ কথন, (গ) যৌথ স্বগতোক্তি—অন্যের উপস্থিতিতে আত্মভাষণ। ভাষা যখন সামাজিক হয়ে ওঠে তখন তার মাধ্যমে শিশু (ক) অন্যের সঙ্গে চিন্তা বিনিময় করে, (খ) অন্যের সমালোচনা করে, (গ) অন্যকে আদেশ দান করে, (ঘ) অনুরোধ জানায়, (ঙ) ভয় দেখায়, (চ) বিবিধ প্রশ্ন করে. (ছ) প্রশ্নের উত্তর দেয়, ইত্যাদি।

নীরব কথন ঃ শিশুর অভিজ্ঞতা যতো বাড়তে থাকে ততোই সে তার মনের অনেক ভাব গোপন করতে শেখে। বড়োরা যখন কথা বলেন শিশুকে তখন চুপ করে থাকতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইভাবে শিশু তার মনের ভাবগুলোকে কথনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে না

পেরে মনে মনে চিন্তা করতে সুরু করে। এই নীরব কথনেরই নাম চিন্তন। আমাদের মনে এমন অনেক ভাবের উদয় হয় যেগুলো প্রকাশ করলে অশান্তি বা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। এই ভাবগুলোকে প্রকাশ ক'রে আমরা মনের গহনে লুকিয়ে রাখি। সেগুলো চিন্তার আকারে আমাদের মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে।

স্বরগ্রামের উচ্চতা ঃ অনেক সময়ে দেখা যায় চেষ্টা ক'রেও কোন কোন লোক ধীরে কথা বলতে পারে না। তাঁদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই ভারি। স্বর যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আরও একটা কারণে স্বরগ্রামের উচ্চতা ঘটতে পারে। শিশুরা অতি শৈশবে ক্রন্দনের সাহায্যে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকে। যথা সময়ে শিশুর প্রতি দৃষ্টি না দিলে সে ক্রমশঃ বেশী জোরে ক্রন্দন করতে থাকে। এই সব শিশুর কণ্ঠস্বর উত্তর জীবনে উচ্চ ও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

উচ্চারণ বিকার ঃ শিশু যা শোনে তাই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু নিখুঁতভাবে কোন একটি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না, তার কারণ তার চার পাশে যাঁরা আছেন তাঁরাই শব্দটাকে নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না। যে শিশুর শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক তার উচ্চারণর বিকার দূর করতে হ'লে তাকে উপহাস না ক'রে তার কাছে শব্দটির নির্ভুল উচ্চারণ বার বার করতে হবে এবং সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। আর যে শিশুর শ্রবণশক্তি দুর্বল তাকে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করবার সময়ে ওষ্ঠ, জিহবা এবং কণ্ঠের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থান ও পরিবর্তন হয় সেগুলি দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শানুভূতির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে হবে।

তোতলামি—তার কারণ ও প্রতিকারঃ অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন শিশু কিছু একটা বলতে যাবার আগে ইতস্তত ক'রছে অথবা বার বার একটা শব্দ উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে। এই আচরণের নাম তোতলামি। তোতলামিটা ভালো জিনিস নয়, কারণ অনেক সময় এর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে অপরের কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়।

অতি শৈশবেই তোতলামির উদ্ভব হয়ে থাকে এবং প্রতিকারের কোন রকম চেষ্টা না করলে এই স্বরবিকৃতি অধিক বয়স পর্যন্ত থেকে যায়। সাধারণত দু-তিন বছর বয়সের সময়, পাঠশালে প্রবেশ করবার সময় এবং যৌবনোদ্গম কালে তোতলামির উৎপত্তি ঘটতে দেখা যায়। এর কারণ, উপরোক্ত সময়গুলিতে পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনে প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার উদ্দেশ্যে শিশুকে রীতিমত প্রয়াস করতে হয়। দু-তিন বছর বয়সের সময় শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বীজটি সবেমাত্র অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে—পরিবেশ থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে উপলব্ধি করতে সুরু ক'রেছে সে। তারপর পাঠশালায় যখন সে এলো তখন তার জগতের রূপটাই গেলো পালটে। নতুন সঙ্গী, নতুন শিক্ষক, নতুন নতুন আসবাবপত্র, বিচিত্র পাঠ্য বিষয় সব কিছু মিলে একটা নতুন বিশ্বের সৃষ্টি ক'রলো তার চারিপাশে। এরপর যখন শিশু যৌবনের পথে পা দিতে সুরু করে তখন তার দেহের বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অসীম পরিবর্তন ঘটে! অপরের কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে স্বাধীনতার জীবনযাপন করার একটা প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে সে। জীবনের এই তিনটি জটিল মুহূর্তে আত্ম-প্রকাশের যে বিপুল প্রেরণার সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে সময়ে সময়ে ভাষার গতি তাল রাখতে পারে না। চিন্তা এগিয়ে চলে, কথা পড়ে পিছিয়ে। তাই মাঝে মাঝে স্বরের বিকার অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অতি সাধারণ কারণটি ছাড়াও তোতলামির আরও অনেক কারণ আছে। শিশুর চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ যদি তোতলা কথা বলেন, তা হ'লে শিশুও নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে অনুকরণ করে। অনুকরণ প্রবৃত্তিটা শিশুর মধ্যে অতিশয় প্রবল, কাজেই অবাঞ্ছিত সঙ্গ থেকে শিশুকে দূরে রাখাই ভালো। কোন শিশু তোতলামি ক'রছে দেখে তাকে উপহাস করলে, অথবা ধীরে ধীরে কথা বলার জন্য উপদেশ দিলে কিংবা সে যে কথাটা বলতে চাইছে সেটা আর কেউ বলে দিলে ফলাফল অত্যন্ত খারাপ হয়ে থাকে।

ধৈর্য ধরে তার কথা শুনতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে যাতে করে সে বুঝতে পারে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখাবার তার কোন রকম প্রয়োজনীয়তা নেই। মাতাপিতা সব সময় লক্ষ্য রাখবেন কী রকম পরিস্থিতিতে তাঁদের শিশুরা তোতলামি ক'রে থাকে। অনেকে পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই কথাবার্তায় তোতলামি সুরু করে। এরা যাতে প্রচুর বিশ্রাম উপভোগ করবার অবকাশ পায় সে রকম ব্যবস্থা করা দরকার। আবার অনেক সময় দেখা যায় বেশী ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এলে কোন কোন শিশু হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং তাদের কথার মধ্যে যথেষ্ট তোতলামি লক্ষিত হয়। এই সব শিশুর সঙ্গীসংখ্যা কমিয়ে দেওয়াই ভালো। আবার বেশী অভ্যাগতের সামনে কোন-কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাতে বলেই যে সব শিশু তোতলা হয়ে ওঠে তাদেরও অনুরূপ পরিস্থিতি থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়। অনেক মাতাপিতা শিশুসন্তানকে অন্যের কাছে শ্লোক, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়ে প্রচুর গৌরব অনভব করেন এবং অসহায় শিশুটি নতুন পরিস্থিতিতে যদি বার বার তার কথা ভুলে যায় অথবা ইতস্তত করতে থাকে, তাহলে তাকে ভয় দেখান। তিরস্কার ও উপহাস ক'রে থাকেন। কিন্তু তাঁদের এই ধরনের আচরণের ফলে শিশুর তোতলামি ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় এবং নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা ছোট হয়ে পড়ে। তাছাড়া মাতাপিতার প্রতি তার মনে বেশ একটা বিরোধিতার ভাবও দানা বাঁধতে থাকে। বিদ্যালয়েও তোতলা ছেলেমেয়েদের প্রতি অত্যন্ত সংযত ও সদয় ব্যবহার করা প্রয়োজন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোন-কিছু উত্তর দিতে বা কিছু মুখস্থ বলতে তাদের পীড়াপীড়ি করা একেবারেই অনুচিত। সবচেয়ে ভালো তাদের নিয়ে একটা ভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় তাদের কথা বলার এই ত্রুটিটিকে মার্জিত করা। মাতাপিতার আর একপ্রকার আচরণের ফলেও শিশুর কথায় তোতলামি প্রকাশ পেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, মাতাপিতা যখন কোন অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ

আলোচনা করছেন এমন সময় শিশু যদি কোন কথা বলতে চায় তাহলে তাকে নিরস্ত ক'রে ভদ্রতা শেখানো হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকাশোন্মুখ চিন্তাস্রোত স্তব্ধ হয়ে পড়লে শিশুর মনে যে আবেগ-রাশি সঞ্চিত হয় তার ফলে সে তোতলা হয়ে পড়তে পারে। উপরোক্ত কারণগুলি ব্যতীত শৈশবকালে মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত, হাম প্রভৃতি শারীরিক পীড়া, পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত কোন স্নায়ুগত বিশিষ্টতা প্রভৃতির ফলেও তোতলামির উৎপত্তি ঘটতে পারে। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ফলে এগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতিবিধান সম্ভব। তোতলামির সবচেয়ে বড় ওষুধ সহানুভূতিসম্পন্ন আচরণ। তোতলা শিশুকে উপহাস না ক'রে ধৈর্য এবং সহানুভূতি দিয়ে তার কথা শুনলে, আবেগময় সকল রকম পরিস্থিতি থেকে তাকে দূরে রাখলে সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। শিশুর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলা, তার প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া এবং কথা বলতে তাকে উৎসাহিত করা সকল মাতাপিতারই একান্ত করণীয় কাজ। কারণ এই সব আচরণ নিখুঁত-ভাবে ভাষাবিকাশের অনুকূল।

স্বাভাবিকভাবে ভাষাবিকাশের অন্তরায়ঃ নানা কারণে স্বাভাবিক ভাবে ভাষা বিকশিত হতে পারে না। প্রথমত, শিশু যদি ভঙ্গিমা-ভাষণের সাহায্যে তার মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে, তবে সে সহজে কথা বলতে চায় না। দ্বিতীয়ত, শিশুর বধিরতা তার ভাষা বিকাশের পথে অতি বড় অন্তরায়। যে শিশু আজন্ম বধির সে স্বভাবতঃই মূক হয়। যদিও তার স্বরযন্ত্র সম্পূর্ণ অক্ষত, তথাপি অন্য কারও কথা শুনতে পায় না বলেই সে কথা বলা শিখতে পারে না। তৃতীয়ত, শিশুর আগ্রহ যদি অন্য দিকে সঞ্চালিত হয় তবে তার ভাষাবিকাশ ব্যাহত হতে পারে। সাধারণত শিশু যখন কথা বলতে আরম্ভ করে সেই সময়ে সে হাঁটতেও সুরু করে। যদি হাঁটাহাঁটিতে সে বেশী আনন্দ পায় তবে ভাষার দিকে তার মনোযোগ মন্দীভূত হয়ে আসে। চতুর্থত, অনেক সময় দেখা যায়

কোন কোন শিশু কোন প্রচলিত ভাষা শিক্ষা না ক'রে আশ্চর্যভাবে তার নিজস্ব সম্পূর্ণ নূতন একটি ভাষা সৃষ্টি করে। এই সব শিশু অনেক দেরিতে প্রচলিত ভাষা শিক্ষা ক'রে থাকে। পঞ্চমত, অনেক সময় মাতা অথবা পিতা শিশু তার মনের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে বলার আগেই তার কথা বুঝতে পারেন এবং তার অভাব পূর্ণ ক'রে থাকেন। এই সব শিশু সম্পূর্ণভাবে বাক্য প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে তাদের ভাষাবিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে, ক্ষুদ্র বাক্য এবং জটিল বাক্য তাড়াতাড়ি ব্যবহার করে, বেশী নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারে, উচ্চারণে কম ভুল করে অর্থাৎ ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভাষা আয়ত্ত করে সহজতর ও সুন্দরতরভাবে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—'নারী জাতি মুখরা', 'নারীর রসনা ক্ষুরধার', ইত্যাদি। জানি না এই সব প্রবাদ বাক্যের পশ্চাতে কতটা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে।

বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার একটা নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধ আছে। সকল বুদ্ধিমান শিশুই তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে না সত্য, কিন্তু যে সব শিশু তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে তারা সাধারণত বুদ্ধিমান হয়। ভাষা বিকাশের ওপর পরিবেশের প্রভাবও অত্যন্ত বেশী। উন্নত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণত বেশী সংখ্যক এবং বেশী মার্জিত ধরনের শব্দ ব্যবহার করে অর্থাৎ তাদের শব্দভান্ডারে অনেক বেশী শব্দরত্ন থাকে। যে সব শিশু অধিক বয়স্ক বালক-বালিকার সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও বেশী সংখ্যক শব্দ ব্যবহার করে, তার কারণ যাদের সঙ্গে তারা মেশে তাদের শব্দসম্ভার প্রচুর।

কোন কোন ক্ষেত্রে যারা ডান হাতের চেয়ে বাম হাতের ব্যবহার বেশী করে তাদের নানারূপ ভাষাবিকার দেখা যায়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোন নিবিড়তম সম্বন্ধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

মানব জীবনে ভাষার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। ভাষাবিকাশের ধারাটি যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তবে মানবমনের বিকাশের ধারাটির সন্ধানও অতি সহজে মিলবে। আমাদের দেশের উন্নত ধরনের শিশুসাহিত্য অতি বিরল। এর প্রধান কারণ শিশুর ভাষায় শিশুর সাহিত্য রচিত হয়নি। আমাদের পরিপক্ক ভাষার সাহায্যে শিশুর কোমল মনে কোন রকম রেখাপাত করা কোন দিন সম্ভব হবে না। সত্যিকারের শিশুসাহিত্য গড়তে হলে শিশুর শব্দসম্ভার জানতে হবে, তার ভাষাবিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার মনোজগতে কী কী পরিবর্তন ঘটে সেটা লক্ষ্য করতে হবে, এক কথায় শৈশবে ভাষা-বিকাশের ধারাটিকে শ্রদ্ধা দিয়ে দরদ দিয়ে অনুসরণ করতে হবে আমাদের।

সমাজ-চেতনার ক্রমবিকাশ

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে অপরাপর প্রাণীর মতো দলবন্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। পুরাকালে মানুষ যখন অনুন্নত ছিল, তখন তারা বৃক্ষ-গহ্বরে অথবা গিরিগুহায় দিনাতিপাত করতো, তখনো বন্যপশু, দুরন্ত প্রকৃতি প্রভৃতি সাধারণ শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের দল বেঁধে বসতি করতে হতো। এই সাধারণ প্রয়োজন ছাড়াও দল বেঁধে বসবাস করার পশ্চাতে আরও অনেক সহজাত প্রেরণার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ নিত্য-বর্তমান। যৌন প্রবৃত্তির প্রেরণায় যখন স্ত্রীপুরুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন একান্ত আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। স্ত্রী-পুরুষের এই মিলনকে সমাজের ক্ষুদ্রতম রূপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার প্রিয়বস্তুকে নিতান্ত নিবিড় করে পাবার ইচ্ছা, তাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। যে দুটি নরনারীর মধ্যে যৌন কারণে মিলন ঘটে তাদের মধ্যে গভীর সম্প্রীতির সঞ্চার হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে নিবিড়তম করে পাবার উদ্দেশ্যে একত্র দিনাতিপাত করতে সুরু করে। কিন্তু আত্ম-সুখের জন্য তারা একত্রিত হলেও তাদের মধ্যে বংশরক্ষা করার যে প্রেরণা বর্তমান তারই প্রভাবে তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে পরিত্যাগ করতে পারে না। পক্ষান্তরে অতিশয় যত্ন সহকারে তারা আপন সন্তানের লালনপালন ক'রে থাকে। যে প্রাণীর মধ্যে সন্তান-বাৎসল্য নাই ধরাপৃষ্ঠে তার অস্তিত্ব বেশী দিন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। তাই প্রকৃতি জনকজননীর মনে সন্তানসন্ততির প্রতি গভীর আকর্ষণ ও সম্প্রীতির সঞ্চার ক'রে দেয়। এই কারণে স্ত্রীপুরুষের মিলনসঞ্জাত ক্ষুদ্রতম সমাজের পরিসর দিনে দিনে প্রসারিত হতে থাকে। দুটি প্রাণীর দ্বারা রচিত নিভৃত সমাজটি একটি ক্রমবর্ধন-

শীল পরিবারে পরিণত হয়। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আবার বিবিধ জৈব কারণে আদান প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জীবন ধারণ করার জন্য যা-কিছুর প্রয়োজন তার সবগুলোই একজন মানুষ সংগ্রহ করতে পারে না। সব কাজ করার যোগ্যতা সকলের নেই এবং সব কিছু করার অনুকূল পরিবেশও সবার ভাগ্যে জোটে না। যারা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী শস্যের জন্য তাদের সমতলবাসীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। যে ভালো তীরের ফলা তৈরী করতে পারে গৃহপালিত পশুর জন্য তাকে এমন আর একজনের ওপর নির্ভর করতে হয় যে নাকি বন্য পশুকে বন্দী করার এবং পোষ মানাবার কৌশলটাকে ভালো ক'রে আয়ত্ত ক'রেছে। এই সব বিভিন্ন কারণে নিকটবর্তী কতকগুলি পরিবারের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যে আদান প্রদান চলতে থাকে। এইভাবে পরিবারের গণ্ডী বিস্তারিত হতে হতে গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একদল মানুষের সঙ্গে আর একদল মানুষের যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। গোষ্ঠীর প্রসারণের ফলে জাতির উদ্ভব হয়। বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে আন্তর্জাতিক সমাজচেতনার বিকাশ ঘটে। জাতির জীবনে এমনি ক'রে ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সমাজচেতনা উন্মেষ লাভ করে। মানুষের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন আছে। যা আমাদের অস্তিত্বের অনুকূল তাকে যদি আমরা সর্বান্তঃকরণে মেনে না নিই, যদি তাকে ভালো না বাসি তাহলে আমাদের জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে। তাই মানুষ দলগত জীবনকে সোহাগ করতে শিখেছে অর্থাৎ সামাজিক জীবনের প্রতি মনে একটা অন্ধ আকর্ষণের গভীর সম্প্রীতির সঞ্চার হয়েছে। এইটাই হলো সমাজবোধ বা সমাজচেতনা। এই সমাজচেতনা একটি ব্যক্তির জীবনে কী ভাবে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে—সমাজবোধের শতদল পদ্মটি একটি ক'রে পাপড়ি খুলতে খুলতে কী ক'রে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সেইটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মনস্তাত্ত্বিকেরা সুদীর্ঘ

ও সুতীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার পর সমাজচেতনার ক্রমোন্মেষের যে ধারাটি আবিষ্কার করেছেন বর্তমান প্রবন্ধে সেই ধারাটিকেই আমরা অনুসরণ করবো।

শিশুর বয়েস যখন প্রায় দু মাস তখন সে মানুষের মুখ দেখে বা কণ্ঠস্বর শুনে হেসে ওঠে। এই হাসিই তার সমাজচেতনার প্রথম স্ফূর্তি অর্থাৎ এই সময় শিশু সর্বপ্রথম তার পাশে আর একজনের উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথম প্রথম শিশু দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখাবয়ব বা কণ্ঠস্বরে কোন রকম পরিবর্তন অনুধাবন করতে পারে না। ক্ষুব্ধ বা ফুল্ল মুখ, তীক্ষ্ন বা মিষ্ট স্বর শিশুর মুখে হাসি ফোটাবার পক্ষে সমান উপযোগী। যখন শিশুর বয়েস প্রায় পাঁচ সাত মাস তখন সে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সমগ্র মুখমণ্ডলটি তন্ন তন্ন ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে শেখে এবং তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখমণ্ডলে ও কণ্ঠস্বরে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটে তার দ্বারা শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বরে বা ক্রুদ্ধ চাহনিতে শিশু ভীত হয়ে পড়ে। মিষ্টস্বরে ও মধুর চাহনিতে তার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। এই সময় শিশু রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না অর্থাৎ পার্শ্ববৃতী ব্যক্তি যদি ক্রোধের ভান করেন তা হলেও শিশু তাঁর এই কৃত্রিম প্রক্ষোভটাকে বাস্তব ব'লে বিশ্বাস করে এবং তার দ্বারা যথারীতি প্রভাবিত হয়। যখন শিশুর বয়স প্রায় আট মাস, তখন থেকে সে কৌতুকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে শেখে এবং তার মধ্যে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। অনেকে মনে করেন হাসির সঙ্গে সমাজ-চেতনার কোন সম্বন্ধ নেই—এটা একটা প্রতিবন্ধ প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাঁদের মতে ক্ষুধার্ত শিশু আহার ক'রে তৃপ্ত হ'লে স্বভাবতঃই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু এইরূপ তৃপ্তির সময়ে সাধারণত মা শিশুর মুখের কাছে নিজের মুখ রেখে নানারকম কথাবার্তা ব'লে থাকেন। বার বার এই রকম ঘটার ফলে শিশু মায়ের মুখ দেখে বা কণ্ঠস্বর

শুনে বা অনুরূপ কিছু প্রত্যক্ষ ক'রে হেসে ওঠে। সুতরাং এই আচরণের পশ্চাতে সমাজ-চেতনার ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছে এমন মনে করার কোন হেতু নাই। এঁদের যুক্তিটা আপাতদৃষ্টিতে বেশ শক্ত মনে হয় বটে, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এটা খুব একটা দৃঢ় যুক্তি নয়। আহারান্তে শিশুর মনে যখন আনন্দের সঞ্চার হয়ে তার মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে, তখন মার মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর ছাড়া আরও অনেক বস্তু নিয়মিত তার চারিপাশে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এই সব বস্তু কখনো শিশুর মুখে হাসির উদ্রেক করতে পারে না। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এই তারতম্যটাকে প্রতিবন্ধ প্রতিক্রিয়ার দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই মেনে নিয়েছেন হাসিটা সমাজ-চেতনার একটা পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ।

শিশু সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে তিনি মাতা, পিতা অথবা অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তি। এই বয়স্ক সঙ্গীটি নিজের কার্যকলাপের সহায়তায় শিশুকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ক'রে থাকেন। প্রায় ছয় মাস বয়সে দুটি শিশুর মধ্যে সংস্পর্শ স্থাপিত হয়। অতি শৈশবেই শিশুদের মধ্যে দুরন্ত, শান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সব মনোভাব প্রধানত বয়স, পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত যে শিশুর বয়স অধিক তার পুষ্টিও অধিক এবং তার কার্যক্ষমতাও বিচিত্র। স্বভাবতঃই সে অল্পবয়স্ক শিশুর ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার ক'রে থাকে।

জীবনের প্রথম বৎসরে শিশুর সঙ্গী থাকে মাত্র একজন। দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যভাগে যদিও তিনটি শিশুকে একত্র খেলা করতে দেখা যায়, তথাপি তৃতীয় বৎসর পর্যন্ত একজনের সঙ্গই শিশু পছন্দ করে। তারপর বয়স যতো বেড়ে চলে সঙ্গী-সংখ্যাও ততো বাড়তে থাকে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ শিশু প্রায়ই দেখা যায় না। যদিও এক থেকে ছয় বৎসর পর্যন্ত বয়সের মধ্যে কতকগুলি সঙ্গীহীন শিশুর দেখা মেলে, তথাপি এও দেখা গেছে যে এক বছর বয়সে

তাদের শতকরা হার যা থাকে দু বছরে থাকে তার চেয়ে কম, তিন বছরে আরও কম। এমনিভাবে তাদের সংখ্যা কমতে কমতে সাত বছর বয়সে তারা সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ সাত বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে কেউই নিঃসঙ্গ থাকে না। বেশী বয়সের শিশুরা বড়ো বড়ো দল রচনা করে। প্রত্যেক দলের এক একজন দলপতি থাকে। যে কোন শিশু ইচ্ছা করলেই দলপতি হতে পারে না। শিশুর বয়স যখন আট-দশ মাস তখনই লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সে ভবিষ্যতে দলপতি হতে পারবে কী না। যে শিশু স্বভাব-দলপতি সে কখনো ভয় দেখিয়ে বা আক্রমণ ক'রে তার সঙ্গীসাথীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে না—উৎসাহিত ক'রে, অনুপ্রাণিত ক'রে, যথারীতি পরিচালিত ক'রে সে তাদের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্য কোন শিশুর সম্মুখে এলে সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে না। খেলাধুলা পরিচালনা করে এবং কাকে কী করতে হবে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেয়। তার পরিচয়ের গন্ডী খুব বড়ো হয়। উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সংগঠনীশক্তি দলপতির চরিত্রের প্রধান উপাদান। দলপতি তার দলের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে প্রয়াস পায়।

খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে অথবা অন্যান্য যেসব স্থানে অনেক শিশুর সমন্বয় ঘটে, সেখানে সর্বপ্রথমে কোন সুনির্দিষ্ট দল থাকে না। এই অসম্বন্ধ শিশু-সমাবেশের মধ্যে হয়তো দু-চারটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের অস্তিত্ব থাকে। ধীরে ধীরে এই স্বতন্ত্র পরিচয়ের গন্ডী প্রসারিত হতে থাকে অর্থাৎ দুজনের অধিক শিশুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে অসম্বন্ধ শিশু-সমাবেশটি একটি সুসম্বন্ধ শিশুর দলে পরিণত হয়। পরস্পরের মধ্যে একপ্রকার আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি দলে সকল সদস্যের মূল্য সমান নয়। যে দলপতি সমগ্র দল তার নির্দেশ মেনে চলে। দলের সদস্যদের তুলনায় দলপতির বেশী বুদ্ধিমান হবার কোন প্রয়োজন নাই। দলের কী দরকার সেটা বুঝবার মতো বুদ্ধি দলপতির থাকলেই যথেষ্ট।

তাছাড়া অন্যান্য সদস্যের পরামর্শ এবং যুক্তি মেনে নেবার মতো উদারতা দলপতির থাকতে হবে। বিদ্যাবত্তা বা বুদ্ধিমত্তা এক্ষেত্রে বড়ো কথা নয়।

কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেহমনের প্রচুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ-তরুণীর মনে সমাজের প্রতি একটা বিদ্রোহী ভাবের সঞ্চার হয়ে থাকে। এই বিদ্রোহীভাব সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় দুই-ই হতে পারে। তরুণীদের ক্ষেত্রে এই মনোভাব দু মাস থেকে ছ মাস পর্যন্ত বর্তমান থাকে এবং প্রথম ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়। তরুণদের ক্ষেত্রেও উক্ত মনোভাবের স্থিতিকাল মাসকয়েক মাত্র। এই মনোভাব অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণতরুণীরা সমাজের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সময় মাত্র একজনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ বন্ধুত্ব অতিশয় আন্তরিক। চলতি কথায় এইরূপ বন্ধুযুগলকে 'মাণিকজোড়' আখ্যা দেওয়া হয়। মাণিকজোড়ের মধ্যে গভীর বিশ্বাস, সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব জন্মে। এই সময় অনেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে আদর্শ-প্রীতি দেখা যায়। কোন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণে মুগ্ধ হয়ে তরুণ-তরুণী তাঁকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করে।

বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক গঠনের ওপর দলগত জীবন প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে। দলের অপরাপর সঙ্গীর তুলনায় যার বুদ্ধি খুব বেশী অথবা কম সে নিজেকে ঠিক মতো তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। কোন কোন শিশুর মানসিক গঠন স্বভাবতঃই এমন যে তারা কোলাহলের চেয়ে নির্জনতাকে বেশী পছন্দ করে। তার এই মানসিক গঠনের বিশিষ্টতা প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—তার বংশধারা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তার মাতা পিতা কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় যদি নির্জনতাপ্রিয় হন, তবে তারও নির্জনতাপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা বহুজনের সংস্পর্শে তার যে সব অভিজ্ঞতা ঘটে সেগুলি যদি তিক্ত

হয়, তবে সে ধীরে ধীরে নিজেকে অপরের সংস্পর্শ হতে দূরে সরিয়ে নেয় এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে সময়ে শিশুর মধ্যে অহংবোধের সঞ্চার হয়, যখন সে প্রথম বিদ্যালয়ে এবং খেলার মাঠে কিংবা অন্য কোথাও সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির মধ্যে আনাগোনা সুরু করে এবং যৌবনাগমে যখন তার মধ্যে প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভব ঘটে, তখন সে অপরের সঙ্গে নিজেকে যথাযথভাবে সহজে মানিয়ে নিতে পারে না। এর ফলে তার সমাজ-চেতনার বিকাশ ব্যাহত হয়। এড্‌লার প্রমুখ মনীষীরা মনে করেন শিশুর সমাজ-চেতনার বিকাশ পরিবারের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়। জ্যেষ্ঠ সন্তানকে মাতাপিতা দায়িত্বশীল ক'রে গড়ে তুলতে চান। সে বহির্বিশ্বের সংস্পর্শে আসার যথেষ্ট সুযোগ পায়। তাই তার সমাজ-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। কনিষ্ঠ সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতাপিতার নয়নমণিস্বরূপ। অধিক মাত্রায় আদর যত্ন পাবার ফলে সে অপরের সুখসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিতে শেখে না। নিজের স্বার্থ পুরোমাত্রায় বুঝতে শেখে এবং পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই কারণে তার মনে সমাজবোধের যথারীতি বিকাশ ঘটতে পারে না। তাছাড়া সৎপুত্র বা কন্যা, পালিত সন্তান, মাতৃ-বা-পিতৃহীন শিশু অথবা অনাথ বালকবালিকাদের মধ্যেও সুস্থ সমাজ-বোধের সঞ্চার হয় না, কারণ তারা ঘরেবাইরে যেরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেগুলি সমাজ-চেতনার প্রতিকূল। বিকলাঙ্গ শিশুরাও সহজে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে না, কারণ সমাজ তাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তার ফলে তাদের মনে একটা হীনতাবোধের সঞ্চার হয়। তারা নিজেদের অন্যের চেয়ে ছোট ক'রে ভাবতে শেখে এবং অন্যের সান্নিধ্য থেকে দূরে দূরে থাকে। সমাজের মধ্যে কোন একটি বিশেষ পরিবারের যে স্থান তার ওপরেও সেই পরিবারের সমাজবোধ বহুলাংশে নির্ভর করে।

শিশু ধীরে ধীরে কীভাবে সামাজিক হয়ে ওঠে সেটা আমরা লক্ষ্য ক'রেছি। যে শিশুটি একদিন অপরের সঙ্গে মেলামেশা করা

দূরের কথা নিজেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করতে পারতো না সে ক্রমে ক্রমে বড়ো হয়ে একজন দুজন ক'রে অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করতে সুরু করে এবং কালক্রমে নিজেকে মানব-সমাজের একজন ব'লে ভাবতে শেখে, অপরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। জাতির সমাজ-চেতনার মূলে যেমন অনেক কারণ আছে তেমনি ব্যক্তির সমাজবোধের পশ্চাতেও কতকগুলি কারণ আছে। সবচেয়ে প্রথমে শিশুর অসহায় অবস্থাই অপরের সান্নিধ্য ও সাহায্যের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে। জীবনধারণের জন্য তার যা প্রয়োজন তা পেতে হ'লে তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যখন তার বয়স প্রায় তিন মাস, তখন সে আন্তরিকভাবে অন্যের সঙ্গ কামনা করে। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনরূপ প্রয়োজনবোধ নাই। তিন মাসের শিশুকে ঘরের মধ্যে একলা ফেলে চলে গেলে অথবা তার প্রতি মনোযোগ না দিলে সে কেঁদে ওঠে। পাশে যারা থাকে শিশু নানাভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পায়। যদি তিন মাসের দুটি শিশুকে পাশাপাশি শুইয়ে রাখা যায়, তবে দেখা যাবে তারা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা ক'রছে। যেখানে একটি সাধারণ বস্তু বা বিষয়ের ওপর অনেকগুলি শিশুর সমান আগ্রহ থাকে, সেখানে তাদের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ স্থাপিত হয়। রঙীন ছবি, খেলার পুতুল প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক সামগ্রীর সাহায্যে একাধিক শিশুকে একত্রিত করা এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত সহজ। শিশু যতো বড়ো হতে থাকে ততোই তার জ্ঞানপিপাসা প্রবলতর হয়। এই পিপাসা মেটাবার উদ্দেশ্যে শিশু অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করে। প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে তার জ্ঞানভাণ্ড পূর্ণতর হতে থাকে। (শিশু সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং সমাজের মধ্যেই তাকে জীবনযাপন করতে হয়। যাদের সঙ্গে তাকে দিনাতিপাত করতে হবে সে যদি তাদের মতো ক'রে নিজেকে গড়ে তুলতে না পারে, তবে তার জীবনযাত্রা অতিশয় কষ্টকর হয়ে উঠবে। তাই চারিপাশে যারা আছে, তাদের অনুকরণ করার

প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে প্রচণ্ড। অন্যকে অনুকরণ করতে হ'লে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে শিশুকে। তাই অনুকরণেচ্ছাও শিশুকে সামাজিক হয়ে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে থাকে। তাছাড়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা, আত্মবিকাশ প্রভৃতি প্রেরণাগুলিও সমাজের বাইরে বিকাশ-লাভ করতে পারে না। শিশু সমাজকে ভালোবাসতে শেখে তার কারণ সমাজ-জীবনেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

শিশুর চিত্রাংকন

চিত্রাংকন একটি অতিশয় সুকুমার শিল্প। চিত্রণের পশ্চাতে আছে শিল্পী-মনের কোমলতা, শিল্পীর সৌন্দর্যানুভূতির গভীরতা, তাঁর আনন্দ-আস্বাদনের নিবিড়তা। স্বভাব-শিল্পী তাঁর চিত্রাংকনের ভেতর দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করেন। বিচিত্রতার মর্ম-স্থলে সৌন্দর্যের, আনন্দের যে ঐকতান নিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে তাকেই উপলব্ধি ক'রে চিত্রকর চিত্রণের মধ্যে এই বিরাট অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। অনন্তকে বন্দী করেন তিনি রেখা দিয়ে—অরূপকে রূপায়িত ক'রে তোলেন রঙের পরশ দিয়ে। কিন্তু এ সব হলো সৌন্দর্য-বোধের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথা। চিত্রের সহায়তায় মানুষ তার সৌন্দর্য-প্রিয়তাকে প্রকাশ করতে শিখেছে, চিত্রণের মাঝে অসীমকে আস্বাদন করতে জেনেছে অনেক শেষে। চিত্রের উৎপত্তি হয়েছিল অন্য উদ্দেশ্যে, অন্য ধরনের অভাব মেটাবার প্রয়োজনে। কেউ কেউ মনে করেন চিত্রের উৎপত্তি হয়েছিল তখন যখন মানুষ ভাষার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করার কৌশলটা শেখেনি। তখন মানুষ পরস্পরের কাছে মনের কথা খুলে বলতো ছবি এঁকে, আকারে ইঙ্গিতে। এই-ভাবে পশু পাখি পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, নদ-নদী, মাঠ-ঘাটের ছবির সৃষ্টি হলো। তখনকার দিনের ভূ-প্রকৃতি, জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা রেখায়িত হলো নানা স্থানে—নরম মাটির গায়ে, নদীর চরে, পাহাড়ের গায়ে, বৃক্ষ-বল্কলে। এক একটি চিত্র একটি সামগ্রীর, প্রাণীর বা ঘটনার প্রতীক হয়ে উঠলো। ভাষার পূর্বে অথবা পরে চিত্রের সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয় নিয়ে মতামতের মধ্যে প্রচুর অনৈক্য দেখা দিতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কিছুই নেই। চিত্রণ ভাষণ অপেক্ষা প্রবীণ কী নবীন যাই হোক না কেন দুটিরই ভেতর যে মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস আছে—অন্যের কাছে নিজেকে উন্মোচিত

ক'রে দেবার প্রেরণা রয়েছে তা অস্বীকার করার কোন যুক্তি-সংগত কারণ নেই। ভাষা এবং চিত্র দুটির পশ্চাতে বিকশিত হয়ে ওঠার, প্রকাশিত হয়ে যাবার যে বেদনা-ধারা চির-প্রবহমান তার কলকল্লোল সহজেই শুনতে পাওয়া যায়।

শিশুর জীবনে ভাষার ক্রমবিকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি। তার সংগে অংকনের ক্রমবিকাশের বেশ সাদৃশ্য আছে। ভাষার মুখ্য উদ্দেশ্য একের চিন্তা ধারণাকে অপরের কাছে প্রকাশ করা। কিন্তু যে জন্ম-ক্রন্দন স্বর-যন্ত্রের সর্বপ্রথম ব্যবহার তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যেমন কোন চিহ্ন নাই সেই রকম আঠারো মাসের একটি শিশু পেনসিল নিয়ে খেলা করার সময় যে সব নানা রকম আঁচড় কাটে তাদের মধ্যে কোন কিছুকে এ'কে প্রকাশ করার ইচ্ছা তার একেবারেই থাকে না। শিশুর বয়স যখন দুবছর তখন সে যে সব আঁচড় কাটে সেগুলো মাঝে মাঝে একত্র সম্মিলিত হয়ে এক একটা রেখাপুঞ্জ সৃষ্টি করে। আড়াই বছর বয়সে শিশুরা কতকগুলো হাবিজাবি রেখা টানে সেগুলোকে হাত, পা, মাথা, চোখ, কান, দরজা, জানালা ইত্যাদি নাম দেয়। আগে যা-তা একটা আঁকে, তারপর সেটার নাম করণ করে। তিন বছর বয়সে শিশু আঁকবার আগে কী আঁকবে সেটা বলে তারপর আঁকে। যে বস্তুটা আঁকতে চায় তার এক একটা অংশ আঁকে, পরে নামটা বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তার সংগে পূর্বে উল্লিখিত বস্তুটার কোনরূপ মিল দেখা যায় না। প্রায় চার পাঁচ বছর বয়সে শিশু যে বস্তুটা আঁকতে চায় তার সংগে তার অঙ্কিত চিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে যে বস্তুটাকে সে আঁকতে চাইছে সেটা যদি তার সম্মুখে থাকে তাতে তার অঙ্কনের বিশেষ কোন লাভ হয় না। বস্তুটাকে এখন যে রকম দেখছে তার চাইতে বস্তুটা সম্বন্ধে সে যা জানে সেটাকেই শিশু তার চিত্রের মধ্যে প্রাধান্য দেয়। তাই শিশু যখন ছবি আঁকে তখন বস্তুটির (নমুনা) অবস্থানের প্রতি সে কোনরূপ দৃষ্টিপাত করে না। সম্মুখে বস্তুটি থাকলে সে যেমন ছবি আঁকে, না থাকলেও ঠিক তেমনি আঁকে। শিশু বিশেষ একটি বস্তু সম্বন্ধে যা জানে তাই

আঁকে, বস্তুটি অঙ্কনকালে শিশুর চোখে যেমন দেখায় তেমনটি সে আঁকে না। শিশুর বয়স যতো বাড়তে থাকে ততোই তার অঙ্কনে কল্পনার প্রাধান্য কমে আসে এবং বস্তুনিষ্ঠা বেড়ে ওঠে অর্থাৎ বাস্তব বস্তুটির সঙ্গে চিত্রিত বস্তুটির বেশ একটা সঙ্গতি দেখা যায়! প্রথমে শিশু একটি বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে যা জানে তাই আঁকতে চেষ্টা করতো। উদাহরণ স্বরূপ মানুষ আঁকতে বললে টুপীর তলায় মাথায় চুল এঁকে দেখাতো, কাপড়ের ভেতর দুটো পা এঁকে দেখাতো। এইভাবে মানুষের ছবি আঁকতে আঁকতে তার যে অভ্যাস হয়ে যায় সেটা ভাঙা খুব সহজ নয়। তাই পরবর্তীকালে যখন শিশু মানুষ সম্বন্ধে যা জানে তা না এঁকে মানুষকে কেমন দেখায় তাই আঁকতে চেষ্টা করে তখন আগেকার অভ্যাসটা তার নতুন প্রচেষ্টাকে রীতিমতো বাধা দেয়। প্রায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা শিশুর চিত্রাঙ্কন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তারপর এই প্রভাব কমে আসে এবং ক্রমে ক্রমে চিত্রাঙ্কন ভাবপ্রকাশের একটা সাধারণ রীতি না হয়ে একটা ক্ষমতা রূপে বিকাশ লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের আঁকা ছবিগুলি বিশ্লেষণ করলে কী ভাবে দিক দূরত্ব, গভীরতা ইত্যাদির প্রত্যয় ধীরে ধীরে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে তা সহজে লক্ষ্য করা যায়। আদিম জাতির শিশুদের আঁকা ছবির সঙ্গে সভ্য জাতির শিশুদের আঁকা ছবির একটা তুলনামূলক বিচার করার বহু প্রচেষ্টা হলেও কোনরূপ নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ আদিম জাতির যেসব শিশুর অঙ্কন সংগৃহীত হয়েছে তাদের প্রায় সকলেরই বয়স বারো বছরের বেশী। আরও অল্পবয়সের অনেক শিশুর চিত্র সংগ্রহ করা দরকার। চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতার সঙ্গে বুদ্ধিশক্তি, বংশধারা, কল্পনাপ্রবণতা ও কল্পনার সজীবতার কিরূপ সম্বন্ধ সেটাও গবেষণা সাপেক্ষ। মনস্তাত্ত্বিকেরা, বিশেষত মনঃসমীক্ষকেরা চিত্রের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। স্থির-বা-অস্থির মস্তিষ্ক মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজের খেয়ালে যে সব ছবি আঁকেন বিশেষজ্ঞগণ সেই

সব ছবির মধ্যে চিত্রকরের মনের পরিচয় লাভ করেন। চিত্রের মধ্যে যে কল্পনা রূপায়িত হয় তার মূলে চিত্রকরের অবচেতন মনের যেসব ক্রিয়াকলাপ বর্তমান মনঃসমীক্ষক সেগুলিকে উদ্ঘাটিত করতে সমর্থ হন। শিশুর চিত্রকে বিশ্লেষণ করলে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

শিশুর বিচিত্র আবেগানুভূতি

আমাদের মনে যেমন নানারকমের আবেগ বা প্রক্ষোভ আছে শিশুর মনেও তেমনি রাশি রাশি রাগ, দ্বেষ, আনন্দ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি নানান রকমের আবেগ আছে। জীবনকে জীবন্ত করে রাখে এরা। আবেগানুভূতি না থাকলে জীবনে কোন রঙ থাকে না, রস থাকে না। কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে এগুলির প্রয়োজন আছে যেমন, তেমনি আবার সংযমের রাশ দিয়ে এদের বেঁধে রাখতে না পারলে এরা আমাদের প্রভূত ক্ষতিসাধনও করে থাকে। সুতরাং আবেগানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে।

আমরা সচরাচর ভুলে যাই যে আমাদের মতো শিশুদের মনেও রাশি রাশি আবেগের সঞ্চার হয়। এ ভুলের ফলে সময় সময় আমরা এমন ধরনের আচরণ করি, যার ফল শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। একটা উদাহরণ দিই। একজন ভদ্রলোক প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে আদর করেন। একদিন অফিসে ঝগড়াঝাটি করে ভগ্ন মন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। আদরিণী মেয়েটি প্রতিদিনের অভ্যাস মতো তাঁর কাছে ছুটে গেলো। কিন্তু ভদ্রলোকের মনের অবস্থা ভালো না থাকায় তিনি তাকে গালাগালি করে দূরে সরিয়ে দিলেন। তাঁর ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু তাঁর এই অসমঞ্জস আচরণে শিশু-কন্যাটির মনে কী রকম আলোড়ন হলো, কী গভীর আবেগের সৃষ্টি হলো তার মনে—সে খবর তিনি পেলেন না। পিতার এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ সন্ধান করতে গিয়ে মেয়েটির মনে কী রকম সংঘাতের উদ্ভব হলো তার খবর কেউ রাখলে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন বাইরের আঘাতে শিশুর মনের ভেতর এমনি করে আবেগের যে ঘূর্ণি জাগে তার নাচন সহজে থামে না। আবেগের এই ঘূর্ণিটাকে

থামাতে গিয়ে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে মনোব্যাধির নানাবিধ লক্ষণ দেখা দেয়। সমাজ-জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে পাগলা গারদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর তখন তাকে জীবন যাপন করতে হয়। মানব জীবনে আবেগের যখন প্রভাব এতো, তখন সকল মাতা-পিতারই শিশুমনের বিচিত্র আবেগরাশির কথা জানা দরকার। কী ভাবে শিশুমনের আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায় সে কৌশলটাও তাঁদের শিখে নিতে হবে। পরের আলোচনা থেকে এবিষয়ে কী করা দরকার সে সম্বন্ধে তাঁরা একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন বলেই মনে হয়।

শিশুর ভয়

(ক) আকস্মিক বিপুল পরিবর্তনে শিশুরা ভয় পায়। যদি হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হয় কিংবা বিপুল বেগে কোন কিছু নড়ে চড়ে ওঠে তাহলে শিশুর মনে ভীতির উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই সব কারণে শিশুরা বাজের শব্দকে এবং কুকুর বানর প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারকে ভয় পায়। শিশু কুকুরকে ভয় করে তার কারণ এই জানোয়ারটির আকস্মিক লম্ফঝম্ফ ও অত্যুচ্চ চীৎকার। শিশুর মন থেকে কুকুর-ভীতি দূর করতে হলে তাকে নানা রকমের মজার মজার কুকুরের গল্প বলে শোনাতে হবে। বিশেষ করে জন্তুটির অপরিসীম প্রভুভক্তির কথা বেশী করে জানাতে হবে তাকে। বাড়িতে কুকুর-শাবক নিয়ে এসে শিশুর খেলার সঙ্গী ক'রে দিতে হবে। শিশু যদি দেখে তার বাবা এবং মা কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন তাহলে সেও নির্ভয়ে জানোয়ারটার কাছে এগিয়ে যাবে এবং তাকে নিয়ে খেলা করবে। একবার দেখা গেলো একটি শিশু গভীর জল দেখলেই ভয় পায়। কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেলো সে একদিন চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলো। এই ব্যাপারটাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কেউ তাকে ধীরে ধীরে চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গিয়ে হাত ধরে জলে নামিয়ে তার ভয় ভাঙিয়ে দেয়নি। তাই সে ভয়টি থেকে গেছে। আর একটি

শিশু নিরীহ খরগোসকে ভয় ক'রতো, তার কারণ সে যখন প্রথম প্রথম খরগোসটাকে ধরতে গিয়েছিলো সে সময়ে তার পার্শ্বচর একটা বিরাট রকম শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন। এই আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দটাই খোকার মনে নিরীহ জন্তুটির প্রতি ভয়ের সঞ্চার করেছিলো। শিশুটিকে ভালো ভালো খাবার দিয়ে, আস্তে আস্তে খরগোসটাকে তার কাছাকাছি নিয়ে এসে তার মন থেকে খরগোস-ভীতি দূর করাও সম্ভব হয়েছিলো। আমাদের অনেক কিছু ভীতির মূলে আছে এই ধরনের ছোটখাটো অভিজ্ঞতা। আপনার খোকাটি হয়তো অন্ধকারকে খুব ভয় করে। তলিয়ে দেখুন কারণটা কী। হয়তো সে একদিন অন্ধকারে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল। হয়তো দেখবেন এই ভয়টা আপনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। অনেক দিন আগে ঘুম পাড়াতে গিয়ে আপনি হয়তো তাকে ভয় দেখিয়েছিলেন অন্ধকার ছাদে জুজুবুড়ি আছে অথবা সে যেই ঘুমিয়েছে অমনি আপনি বাতি নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চীৎকার ক'রে মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন, সেই বিরাট শব্দে খোকার ঘুম ভেঙে গেলো। সে চারিদিকে চেয়ে দেখলো অন্ধকার। সেদিন থেকেই অন্ধকারকে সে ভয় করতে শিখেছে অথচ আপনি সেটা লক্ষ্যই করেন নি। মনস্তাত্ত্বিকের কাছে এলে আপনার খোকার ভয় ভাঙানোর জন্য তিনি হয়তো নানারকম উপদেশ দেবেন। বলবেন খোকা যখন অন্ধকারে থাকবে মা যেন তার পাশে থাকেন। নানারকম সুন্দর গল্প বলে ছড়া কেটে, গান গেয়ে অন্ধকার হতে তার মনকে অন্য দিকে আকর্ষণ করেন। অথবা খোকা যে ঘরে শোবে সে ঘরে বাতি জ্বলবে ঠিকই। কিন্তু প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বাতিটা কমিয়ে দিতে হবে। একটু একটু করে বাতিটা একদিন সত্যি সত্যি নিবে যাবে অথচ খোকা সেটা টেরই পাবে না। খুব সহজ ব্যাপার হলেও অনেক মাতাপিতাই ছেলে মেয়েদের ভয় ভাঙানোর এই অতি সহজ উপায়-গুলো জানেন না।

আঁধার-ভীতির আরও নানারকম কারণ থাকতে পারে। অন্ধকারে শিশু আর কাউকে নিজের পাশে দেখতে না পেয়ে নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ মনে করে। অপরের সঙ্গ, বিশেষ করে মায়ের সঙ্গ শিশু সর্বান্তঃকরণে কামনা করে, তার কারণ সে মাকে গভীর-ভাবে ভালবাসে তাই নিবিড় করে পেতে চায় এবং মায়ের উপর নির্ভর করে; তাই মা কাছে না থাকলে অথবা যাকে সে ভালবাসে এবং যার উপর নির্ভর করতে পারে এমন আর কেউ তার কাছে না থাকলে সে নিজেকে বড়ো বেশী অসহায় মনে করে। এই অসহায়তার অনুভূতিই তার মধ্যে নানারকম কাল্পনিক ভীতির সৃষ্টি ক'রে থাকে। সুতরাং আঁধার-ভীতির একটা কারণ হ'তে পারে অসহায়ত্বের অনুভূতি। তাছাড়া মাতা-পিতা নিজেদের বিশ্লেষণ ক'রলে বুঝতে পারবেন তাঁরা তাঁদের সকল সন্তানকেই সমানভাবে ভালবাসেন এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নানাবিধ স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের ক্ষেত্রে তাঁদের ভালবাসার তারতম্য ঘটে। আবার একটি বিশেষ শিশুকেও তাঁরা সব সময় একই রকম ভাবে ভালবাসতে পারেন না। শিশুটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা ভালবাসেন, কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসেন না। তাছাড়া শিশুর প্রতি তাঁদের ভালবাসাটা বহুলাংশে তাঁদের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাঁদের মনের অবস্থা যখন শান্ত তখন তাঁরা শিশুকে ভালবাসেন, তাঁদের মনের অবস্থা যখন বিক্ষুব্ধ তখন তাঁরা শিশুকে অনাদর করেন। কোন একটি বিশেষ শিশুর প্রতি মাতাপিতার মনোভাব অনেকাংশে তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ছোট বড় আরও অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। শিশুটি যদি অবাঞ্ছিত হয়. পরিবারের অন্যান্য সকলে যদি শিশুটির আচরণে অসন্তুষ্ট হয় কিংবা শিশুটি যদি মাতাপিতার বাসনার বিপরীত হয়ে জন্মায় অর্থাৎ ছেলে না হ'য়ে মেয়ে হ'য়ে জন্মায় কিংবা মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হ'য়ে জন্মায় তাহলে তার প্রতি মাতাপিতার মনোভাব প্রতিকূল হ'তে পারে।

শিশুর প্রতি মাতাপিতার ভালবাসার যেমন নানা কারণে তারতম্য ঘটে তেমনি নানাকারণে মাতাপিতার প্রতিও শিশুর ভালবাসার বিভিন্নতা ঘটে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশুপুত্র মাতার প্রতি এবং শিশুকন্যা পিতার প্রতি বেশী আসক্ত। পিতাও তেমনি কন্যার প্রতি এবং মাতা পুত্রের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে থাকেন। মাতাপুত্র ও পিতাপুত্রীর এই পারস্পরিক অনুরক্তির কারণ পিতা পুত্রীর মধ্যে স্ত্রীর অনেক গুণ (যেগুলো তিনি ভালবাসেন, যেমন চলনবলন, দেহের গড়ন ইত্যাদি) লক্ষ্য করেন এবং মাতা পুত্রের মধ্যে স্বামীর অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য থাকলেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ মাঝে মাঝে এমন প্রকট হ'য়ে ওঠে যে একজন অপরজনের আধিপত্যের বাইরে চ'লে যান। শিশুদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তেমন প্রকট নয় বলে (বিশষ ক'রে ভালবাসার ক্ষেত্রে) মাতা-পিতা পুত্র-পুত্রীকে পরস্পরের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রতে চান। পুত্র-পুত্রীও মাতাপিতার ভালবাসায় সম্পূর্ণভাবে সাড়া দেয়। পুত্র মাতাকে এবং পুত্রী পিতাকে অধিকতর ভালবাসে বলে তাঁদের নিতান্ত আপন ক'রে পেতে চায়। কিন্তু পুত্র যখন দেখে তার মাতার ভালবাসায় তার পিতা তার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন সে পিতার প্রতি বিরূপ হ'য়ে ওঠে। ঠিক একই কারণে কন্যা মাতার প্রতি বিরূপ হয়। কিন্তু শিশুর মনে মাতাপিতার প্রতি এই বিরোধীতাটা সহজে আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারে না। পুত্র পিতাকে মাতার ভালবাসায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে সত্যি, কিন্তু সে পিতাকে ভালও বাসে। সে পিতার মতো শক্তিশালী হতে চায়। তাঁর মতো বড়ো হ'তে চায়। তাঁর মতো বিভিন্ন কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন ক'রতে চায়। পিতার প্রতি এই বিপরীতমুখী মনোভাবের জন্য পুত্রের মধ্যে (এবং মাতার প্রতি কন্যার মনোভাবের মধ্যে) প্রচণ্ড সংঘাত বাধে। শিশু একটু বড়ো হ'লে সাধারণত মাতাপিতা তাকে পৃথক ঘরে বিছানায় শুতে শেখান। পিতা মাতার

সঙ্গে থাকবেন অথচ পুত্র থাকবে দূরে কিংবা মাতা থাকবেন পিতার কাছে অথচ কন্যা দূরে থাকবে পুত্রকন্যা কিছুতেই এই ব্যবস্থাটাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারে না। তাই পুত্র পিতার প্রতি এবং কন্যা মাতার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে। অথচ মাতা ও পিতা উভয়ের প্রতি শিশুর মনে যে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে তার ফলে তাদের ঈর্ষ্যা নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রতে পারে না। অন্ধকারে একলাঘরে তাদের এই ঈর্ষ্যা নানাবিধ কাল্পনিক ভয়ের রূপ গ্রহণ ক'রে, কিংবা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের আকারে প্রকাশিত হয়। মাতাপিতা তখন বাধ্য হ'য়ে তাদের নিজেদের সঙ্গে নিতে বাধ্য হন। এই রকম ঈর্ষ্যা-জনিত অন্ধকার ভীতির কিংবা দুঃস্বপ্নের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক ভদ্রলোক সপ্তাহে কয়েকদিন রাত্তির বেলায় কাজ ক'রতে যেতেন। যেদিন তিনি বাড়ি থাকতেন সেই দিনই তাঁর শিশুপুত্রটি একলাঘরে দুঃস্বপ্ন দেখে বা ভয় পেয়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী যে ঘরে থাকতেন সে ঘরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি ক'রতো। কিন্তু যে দিন তিনি রাত্তিরে বাড়ি থাকতেন না সেদিন শিশুটি স্বপ্নবিহীন নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন হ'য়ে থাকতো। এসব ক্ষেত্রে শিশুর ভয় দূর ক'রতে হলে অনেক সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে হবে। প্রথমত পুত্রের প্রতি মাতার এবং কন্যার প্রতি পিতার ভালবাসা যেন অসংযত ও দুর্বার হ'য়ে আত্মপ্রকাশ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত পিতার উচিত মাতার কাজে পুত্রকে সাহায্য ক'রতে উৎসাহিত করা এবং মাতার উচিত কন্যাকে পিতার কাজে সহায়তা ক'রতে সুযোগ দেওয়া। পুত্র যদি নানাভাবে মাতাকে ছোটখাটো সাংসারিক কাজে সাহায্য করার সুযোগ পায় তা হ'লে মায়ের প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ পাবার সুযোগ পেয়ে সে আত্মতৃপ্তি অনুভব ক'রবে এবং পিতা তাকে মাকে সাহায্য করার সুযোগ দিয়েছেন দেখে তাঁর প্রতি তার বিরূপভাব মন্দীভূত হ'য়ে আসবে। পিতার সেবা ক'রতে পেলে কন্যাও খুশী হবে এবং মাকে ভালো মনে ক'রবে। তৃতীয়ত ছোটবেলা থেকেই শিশুকে আলাদা ঘরে

শোয়ানোর ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তার ফলে আলাদা ঘরে শোয়াটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এই রকম আরও অনেক উপায়ে (পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুযায়ী) শিশুর ভয় ভাঙানো সম্ভব। মাতা বা পিতার প্রতি ঈর্ষ্যা যেমন শিশুকে ভয়ান্বিত ক'রতে পারে, নবাগত ভাই বা ভগ্নিটির প্রতি ঈর্ষ্যাও সেই রকম তাকে ভীত ক'রে তুলতে পারে। নবাগতটি মায়ের স্নেহে তার আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ ক'রেছে দেখে শিশু স্বভাবতঃই তার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবে সে যখন মাকে সম্পূর্ণ আপন ক'রে ফিরে পায় না তখন নবাগতটির মতো আচরণ ক'রে (শয্যা সিক্ত ক'রে, কান্নাকাটি করে, নিজের হাতে খাবার ক্ষমতা হারিয়ে, ইত্যাদি) মাকে ফিরে পেতে চায়. কিংবা নানারকম অস্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হ'য়ে নিজেকে অসহায় ক'রে তুলে সে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে প্রয়াস পায়। বলা বাহুল্য এই সব ভীতি অস্বাভাবিক হ'লেও শিশুর কাছে চরম সত্য হতে পারে। শিশুর আপন কল্পনা বাস্তবের মতো জীবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে। নবাগত যখন আসবে তখন শিশুটিকে নবাগতের প্রতি সদয় ক'রে তোলার চেষ্টা ক'রতে হবে। তার উপর নবাগতটিকে খেলানোর, খাওয়ানোর, ঘুমপাড়ানোর, দেখাশোনা করার ভার দিতে হবে। তখন সে নিজেকে নবাগতটির মা মনে ক'রে মায়ের কাছে সে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা ক'রে নবাগতটির প্রতি ঠিক সেই রকম ব্যবহার ক'রতে চেষ্টা ক'রবে। কথায় কথায় নবাগতটির সঙ্গে তার নিজের সাদৃশ্যমূলক তুলনা ক'রতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ মা যখন ঝিনুকে ক'রে নবাগতটিকে দুধ খাওয়াবেন তখন বড় শিশুটিকে বলতে পারেন—"বুঝলে খোকন, তুমি যখন এর মতো ছোট ছিলে তখন ঠিক এমনি ক'রে তোমাকে দুধ খাওয়াতুম।" এইভাবে বার বার শিশুটির সঙ্গে নবাগতের তুলনা ক'রলে নবাগতের সঙ্গে শিশুটি একাত্মবোধ ক'রতে শিখবে। তার প্রতি শিশুটির ঈর্ষ্যার ভাব ধীরে ধীরে কমে আসবে। মাতাপিতা বা নবাগত ভাই-ভগিনীর প্রতি ঈর্ষ্যার ফলে অনেক সময় শিশুর মধ্যে মৃত্যু-ভীতি

দেখা দিতে পারে। তার সত্ত্বার একটি অংশ চাইছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীটির মরণ হয়, অপর একটি অংশ এই কামনার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তাই অনেক সময় মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকম অস্বাভাবিক প্রশ্ন বা ভীতি শিশুর মনে সঞ্চারিত হয়। ঈর্ষ্যার প্রবলতা কমে আসলে এই সব ভীতির সংখ্যা এবং গভীরতাও কমে আসবে। অনেক সময় শিশু এমন অনেক বস্তুকে ভয় পায় আপাতদৃষ্টিতে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি শিশু বাসে চ'ড়তে ভয় পেতো। কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল বাসে চ'ড়লে বাস তাকে মার থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে এই রকম একটা অনুভূতির সঞ্চার হ'য়েছিল তার মনে। সুতরাং বাসের ভয়টা তার মাকে হারাবারই ভয়; নিঃসঙ্গতার, অসহায়ত্বের ভয়। শিশুর ভয় বিদূরীত ক'রতে হলে প্রথমে তার ভয়ের প্রকৃত অর্থটা আবিষ্কার ক'রতে হবে, তারপর ভয়ের কারণটাকে অপসরণ করতে চেষ্টা ক'রতে হবে।

(খ) অনুকরণ সঞ্জাত ভীতি—অনেক সময় শিশুরা মাতাপিতা এবং তার চারপাশে অন্য যারা থাকে তাদের অনুকরণ ক'রে অনেক অনেক জিনিসকে ভয় ক'রতে শেখে। যার মা-বাবা ঝড়বাদলা, বজ্রবিদ্যুৎ ইত্যাদিকে ভয় করেন সে শিশুও এই সব সামগ্রীকে ভয় ক'রতে শেখে। আরশুলা, মাকড়সা প্রভৃতি নিরীহ কীটপতঙ্গের প্রতি ভীতিও এইভাবে শিশু মনে শেকড় গেড়ে বসে। এই সব ভীতি শিশুমন থেকে অপসরণ করবার আগে বয়স্কদের নিজের মন থেকে সেগুলিকে তাড়াতে হবে। অনেক সময় পরিবারের মধ্যে নানারকম ভয়ের কাহিনী আলোচনার ফলে শিশুর মনে নানারকম ভীতির সঞ্চার হয়ে থাকে। সুতরাং এই ধরনের আলোচনা শিশুর সম্মুখে না করাই শ্রেয়।

(গ) অন্য ধরনের ভীতি—অধিকাংশ মাতাপিতাই কামনা করেন তাঁদের ছেলেমেয়ে অন্য সকল ছেলেমেয়ের সেরা হোক। তাঁদের এই কামনাকে সফল করার উদ্দেশ্যে তাঁরা শিশু সন্তানের সম্মুখে

নিজেদের অভিপ্রেত অতি উচ্চ একটি আদর্শ স্থাপন করেন। কিন্তু এমন হতে পারে যে, তাঁদের এই আদর্শ সফল ক'রে তুলবার শক্তি শিশুর নেই। যেদিক দিয়ে উন্নতি করবার তার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সেটা হয়তো সম্পূর্ণ আর একটা দিক। কিন্তু মাতা-পিতাকে খুশী করতে গিয়ে শিশু যতই ব্যর্থ হতে থাকে ততই তার মধ্যে এক প্রকার ভীতির সঞ্চার হয়। নূতন পরিবেশের সম্মুখীন হতে হলেই তার দেহ শিহরিত হয়, মন সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই ভয়টা আরও প্রকট হয় তখনই, যখন পিতামাতা তার ব্যর্থতার জন্য নানাভাবে তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এর ফলে শুধু যে ভয়টাই বেশী হয় তা নয়, শিশুর নৈতিক চরিত্রেরও যথেষ্ট অধঃপতন ঘটে। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা দরকার। জনৈক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসবার আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। মজার ব্যাপার এই যে, তিনি অঙ্কে সুপণ্ডিত হলে কী হবে, তাঁর একমাত্র পুত্রের অঙ্কে ভালো মাথা ছিলো না। তাঁর ধারণা তাঁর পুত্র যদি অঙ্কে কাঁচা হয়, তাহলে তাঁরই গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতেন। অঙ্ক কষতে ভুল করলেই শিশুটির ভাগ্যে জুটতো লাঞ্ছনা আর তিরস্কার। ফলে শিশুটি তার পিতাকে অত্যন্ত ভয় করতে সুরু করে এবং যথা-সম্ভব তাঁকে এড়িয়ে চলতে শেখে। একদিন নতুন শিক্ষক এলেন তাকে পড়াতে। পড়বার ঘরে তার বাবাও বসে বসে নিজের কাজ করছিলেন আর ছেলের পড়ায় নজর রাখছিলেন। শিক্ষক মশাই একটা অঙ্ক কষতে দিলেন শিশুটিকে। খাতার একটা পাতা বার দুই উল্টোবার পর শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে শিশুটি একটি পেনসিল আনবার নাম ক'রে তার বইয়ের আলমারীর কাছে উঠে গেলো। সেখানে কিন্তু পেনসিল না খুঁজে সে আর একটা খাতা উল্টে কি যেন দেখে নিলো। তারপর পড়ার টেবিলে ব'সে অঙ্কটা কষে মাষ্টার মশাইকে দেখতে দিলো। গোড়া থেকেই আমি তার কার্য-

কলাপ লক্ষ্য করছিলাম। এবার উঠে গিয়ে আলমারী থেকে সেই খাতাটা নিয়ে এলাম যেটা সে একটু আগেই দেখে এসেছিলো। দেখলাম মাস্টার মশাই তাকে যে অঙ্কটা কষতে দিয়েছিলেন সেটা সেখানে কষে দেওয়া আছে। সেই অঙ্কটাই তাকে তারপর কষতে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু সে সফল হয়নি। এই শিশুটির কোমল মনে চুরি ক'রে কৃতিত্ব নেবার এই যে এতটা প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে সেটা কি তার পিতাই সৃষ্টি করেন নি? তাঁকে খুশী ক'রে তাঁর তিরস্কার এবং শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার অভিপ্রায়েই তো আজ সে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এমনি ভাবে বাপ মা'র হাতেই কতো যে কোমলমতি শিশুর নৈতিক অবনতি ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই।

নিজের কাজ হাসিল করার জন্য অনেক মা শিশুকে অযথা ভয় দেখান—জুজুর ভয়, বুড়োর ভয় ইত্যাদি। হয়তো সাময়িকভাবে এতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়, ভয় পেয়ে শিশু তার ওজর আবদার ত্যাগ করে। কিন্তু এর ফলে নানা রকম অযথা ভয় তাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাদের স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন ক'রে থাকে।

শিশুর ভয়কে কখনও উপহাস করা ভালো নয়। তার ভয় যদি কাল্পনিক হয় তবুও না। মার কাছে যে শিশুটি শুনেছে যে একটা খু-উ-ব বড়ো ঝুরি নামানো অন্ধকার বটগাছের ভেতর একটা ডাইনী বুড়ী বাস করতো, সে হয়তো একথা শোনার পর তাদের গাঁয়ের পুকুর পাড়ে যে পুরানো বট-টা আছে, সেটাকে একটা অদৃশ্য ডাইনীর আস্তানা বলে ধরে নিয়েছে। ভুলেও সে ওপাশ দিয়ে মাড়ায় না। মা যদি তার এই ভয়টার খবর পেয়ে এ নিয়ে হাসি-তামাশা করেন অথবা রাশি রাশি যুক্তির অবতারণা ক'রে তার ভয় ভাঙাতে চেষ্টা করেন, তাহলে ফলটা বিপরীত হবে। কিন্তু তিনি যদি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরপাড়ে বটতলায় যান এবং চারিপাশে ঘুরে ফিরে তাকে দেখিয়ে দেন যে, ডাইনী বুড়ীর

নামগন্ধও সেখানে নেই, তাহলে তার ভয়টা ভেঙে যাবে। উপদেশের চাইতে উদাহরণই যে এসব ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী সেকথাটা মাতাপিতাকে মনে রাখতে হবে সব সময়ই।

রূপকথা ও শিশু-মন

কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন যে, শিশুদের কাছে ডাইনী বুড়ী, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব ইত্যাদির বিষয়ে কাহিনী বলা ঠিক কি না। আমাদের দেশে এবং সকল দেশেই এমন অজস্র রূপকথা লোকসমাজে প্রচলিত আছে, যাদের মধ্যে এই সব ভয়াবহ প্রাণীর ছড়াছড়ির অন্ত নাই। ঠাকুরমা দিদিমারা চিরকালই খোকাখুকুদের এইসব অপরূপ রূপকথা শুনিয়ে এসেছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে রূপকথার রাজপুত্তুর সব সময়ই ডাইনীর চোখে ধুলো দিয়েছে। রাক্ষসরাক্ষসীর মাথা কেটেছে এবং ভীষণ যুদ্ধে দৈত্য-দানবকে পরাস্ত ক'রে বন্দিনী রাজনন্দিনীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে। বলা বাহুল্য বলার ভংগীতে এই সব গল্প-কাহিনী শিশু-মনে অসীম সাহসের সঞ্চার করে। তার মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মায় যে, সেও রাজপুত্তুরের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়েও বিজয়মাল্য অর্জন ক'রে আনবে। এইসব রূপকথা শিশুর কল্পনাকে প্রখর করে। তার মনে অনন্ত সাহসের সঞ্চার করে।

শিশুর রোষ

যে শিশু রাগ করতে জানে না, সুবোধ শিশুর মতো সব সময়ই অন্যের কথা মেনে চলে বুঝতে হবে তার মানসিক বিকাশ ঠিকমত সম্পাদিত হয়নি। এ দুনিয়ায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না। অনেক সময় রাগ দেখাবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু রাগ করবার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি রাগের মাত্রা বেশী হয়ে গেলে কিংবা অকারণে রাগ করলে

দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যেরই প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। তাই এ বিষয়ে সংযম শিক্ষারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সাধারণত শিশুরা রুষ্ট হয় তখনই, যখন তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় ও অঙ্গ-সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যে ছোট্ট মেয়েটি পুতুল খেলায় ব্যস্ত হয়ে আছে, তাকে যদি তার মা খাবার খেতে পীড়া-পীড়ি করেন, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যদি খেলা থেকে তুলে নিয়ে যান, তবে সে নিশ্চয়ই রাগ করবে। হয় ডাক ছেড়ে কান্নাকাটি করবে, না হয় মুখ গুমরে চুপ ক'রে বসে থাকবে। কারও সঙ্গে একটাও কথা বলবে না। ডাকলে শুনবে না। একটি ছোট্ট খোকা বাগানের বাঁশতলায় বসে একদিন শুকনো বালি দিয়ে ঘর তৈরী করতে চেষ্টা করছিল। বালির ওপর বালি কিছুতেই এঁটে বসছিল না। তাই ঘরও আর উঠছিল না। বার বার চেষ্টার ফলেও যখন খোকা ব্যর্থ হলো, তখন দেখা গেল, রেগেমেগে সে খেলার উপকরণগুলোকে ছুঁড়ে ফেলছে। তার ফুলের মত সুন্দর কচি মুখটি উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। এমনিভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিশুর রাগের পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে তার প্রতিহত ইচ্ছারাশি।

ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়লেও শিশুরা অনেক সময় রেগে ওঠে। সময় মত যদি তাদের খাবার দেওয়া হয় এবং ঘুমোবার প্রচুর অবকাশ দেওয়া যায়, তাহলে তারা অকারণ রাগ প্রকাশ করবার প্রয়োজন বোধ করবে না। যে সমস্ত ছেলেমেয়েকে শৈশবে নিয়মিত খাবার এবং বিশ্রাম দেওয়া হয়নি, বড় হলে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে। নিয়মিত খাবার এবং নিদ্রার আয়োজন করা ছাড়া মাতাপিতা শিশুকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন যাতে তারা তাদের ইচ্ছাপূর্তির পথে যে সব বাধা সেগুলিকে অতিক্রম করতে পারে। ওপরে যে শিশুটির কথা বলা হয়েছে, সে যখন বার বার চেষ্টা করেও বালির ঘর তৈরী করতে পারছিল না, তখন যদি

ভেজা মাটি দিয়ে ঘর তৈরীর কাজে তাকে সাহায্য করা হতো, তাহলে তার রাগ করবার কোন কারণই ঘটতো না।

শিশু যাতে রাগান্বিত না হয় এতক্ষণ সেই কথাই বলা হলো। কিন্তু যখন সে সত্যি রেগে ওঠে, তখন তার প্রতি কি রকম আচরণ করা উচিত, সেটাও মাতাপিতার জানা দরকার। সকলেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন, শিশু রেগে উঠলে তার প্রতি যদি মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহলে তার রাগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। মা যখন তাকে নানাভবে বোঝাতে চেষ্টা করেন, তখন তার কান্নার ঘটা ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে শিশু নিজেকে খুব বেশী মূল্য দিয়ে ফেলে এবং নিজের জিদ জাহির করার উদ্দেশ্যে কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। এক্ষেত্রে শিশুর রোষকে উপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন কিছুই ঘটেনি। শিশু রাগ করলে মাতাপিতাও যদি রেগে ওঠেন, তাহলে তার ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এতে শিশু আরও বেশী রেগে উঠবে। যদি তাঁরা শিশুকে তার রাগের জন্য বকাবকি করেন অথবা যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন, তাহলে শিশু বুঝবে তাঁরা নিতান্তই অক্ষম। সব চেয়ে ভাল, শিশু যখন রেগে ওঠে, তার রাগটাকে উপেক্ষা ক'রে চলা এবং সম্ভব হলে তার সম্মুখ থেকে সরে যাওয়া। তাহলে শিশু তার রাগটাকে নিরর্থক মনে করবে এবং ধীরে ধীরে তার আবেগ প্রশমিত হয়ে আসবে। অনেকেই রুষ্ট শিশুকে বন্ধ ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখেন। এ রকম শাস্তি-বিধানের ফল হয় খুব খারাপ। শিশুর মনে বন্ধ ঘরের প্রতি একটা অস্বাভাবিক ভীতির সৃষ্টি হতে পারে এবং মাতাপিতার বিরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পূর্বেই বলেছি দু-তিন বছর বয়সের সময় সকল শিশুর মধ্যেই একটা ঋণাত্মক অর্থাৎ 'না' বলার মনোভাব দেখা যায়। এ সময় তাদের এটা করো, ওটা করো, সেটা করো না ইত্যাদি ধরনের আদেশ উপদেশ দিয়ে বিব্রত ক'রে তুললে তারা অবশ্য রুষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ প্রায় সব কিছুতেই 'না'

বলার প্রেরণা তাদের মধ্যে তখন অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই প্রেরণা ব্যাহত হলেই তাদের মনে রোষের সঞ্চার হয়। জোর ক'রে যদি শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহলে সে খিট্‌খিটে, একগুঁয়ে, অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং যাঁরা তার স্বাধীনতায় বাধা দান করেন, তাঁদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতে শেখে। সুতরাং শিশুর কাজে কর্মে অনাবশ্যক বাধা সৃষ্টি না ক'রে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু এ কথাটা সকলকে মনে রাখতে হবে যে, সকল রকম আবেগময় পরিবেশ থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত হয়ে সে গড়ে উঠবে না। সংসারে অনেক রকম আবেগময় পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে একদিন হতেই হবে, সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে সে যাতে সফলতা অর্জন করতে পারে, সেই মত শিক্ষাই তাকে দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে দু-একটা উদাহরণ দিলে মাতাপিতা তাঁদের কি করণীয় সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। অনেক সময় শিশু জোরে দৌড়াদৌড়ি করলে মাতাপিতা হৈ-হৈ করে ওঠেন। বলে ওঠেন—ওরে, ছুটিসনি বাবা, পড়ে যাবি যে। অথবা সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটা যখন ওপরে উঠছে তাই দেখে মায়ের বুক হয়তো কেঁপে ওঠে। ছুটে গিয়ে তিনি খুকীকে নামিয়ে আনেন। এই সব অকারণ স্নেহ মায়া উদ্বেগগুলোকে জয় করা দরকার। উপরোক্ত পরিস্থিতি-গুলোতে শিশুকে নিরুৎসাহ কিংবা নিরস্ত না ক'রে সে যাতে সাফল্য অর্জন করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে শিশুটি দৌড়াদৌড়ি করছে তাকে দৌড়তেই দিতে হবে। যদি পড়ে গিয়ে মাথায় একটু আঘাত লেগে যায়, তাহলে যথারীতি চিকিৎসা করলেই চলবে। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত না লাগে, পা হাতগুলো চিরকালের মতো অকর্মন্য হয়ে না পড়ে। এর জন্য চাই মাতাপিতার সতর্কতা। যে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে উঠছে তাকে নামিয়ে না এনে মা যদি তার পেছনে পেছনে ওপরে ওঠেন তাহলে উৎসাহিত হয়ে মেয়েটা আরও

ওপরে উঠবে, তার সাহস আরও বাড়বে। যদি সে পড়ে যায় তাহলে তো মা পেছনেই আছেন—তিনি তাকে ধরে ফেলবেন। সুতরাং বিপদের পরিস্থিতিতে ফেলে বিপদকে জয় করার শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে।

শিশুর অঙ্গুলি লেহন

লক্ষ্য করলে সকলেই দেখতে পাবেন প্রায় সকল শিশুই এক বছর বয়সের মধ্যে যখন তখন নিজের হাতের বুড়ো আঙ্গুল চুষে থাকে। ক্ষুধিত শিশু যখন মার স্তন্য পান করে, তখন তার ঠোঁট দুটিতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার ফলে সে অতিশয় আনন্দের আস্বাদ পায়। তাই ক্ষুধা নিবৃত্ত হলেও সে মাতৃস্তন্যপানে নিরস্ত হয় না। কিন্তু মা সব সময়ই শিশুর কাছে থাকতে পারেন না, তাঁর আরও অনেক কাজ থাকে, তাই শিশু মাতৃস্তনের পরিবর্তে তার নিজের আঙ্গুল চুষে ওষ্ঠসঞ্জাত আনন্দের আস্বাদন ক'রে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেশী বয়সের শিশুরা এবং বয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ আঙ্গুল চোষা অথবা দাঁত দিয়ে নখ খোঁটার অভ্যাস থেকে মুক্তি পাননি। এই সমস্ত ব্যক্তি যখন বহির্জগতে কোন বাধার সম্মুখীন হন অথবা কোন আবেগময় পরিস্থিতিতে পতিত হন তখন শিশুসুলভ উপায়ে অর্থাৎ অঙ্গুলি লেহন ক'রে অথবা দাঁত দিয়ে নখ খুঁটে নিজের অজ্ঞাতে আনন্দের সন্ধান করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তাঁদের এই অভ্যাস নিয়ে হাসি তামাশা করলে বা উপদেশ বৃষ্টি করলে কোনই লাভ হবে না। উত্তেজনাময় পরিবেশ থেকে শিশুদের দূরে রাখা এবং প্রফুল্ল রাখা, অবসাদ ক্লান্তি ক্ষুধা প্রভৃতি অনুভূতিগুলি যেন পীড়াপ্রদ হয়ে ওঠার সময় না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, শাসন তিরস্কার প্রভৃতি হতে তাদের নিষ্কৃতি দান করা এবং মজার মজার খেলা ও কাজ কর্মের মধ্যে তাদের ব্যস্ত ক'রে রাখাই এসব ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। উৎসাহ ও প্রশংসা এই প্রসঙ্গে তিরস্কার ও তাড়না অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী।

খেলাধ‌ুলা

খেলাধ‌ুলার প্রতি শিশ‌ুর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রীতি আছে। শিশ‌ুরা খেলাধ‌ুলা ছাড়া থাকতে পারে না। নানা প্রকার খেলাধ‌ুলার ভেতর দিয়ে তারা প্রচুর আনন্দ আস্বাদন করে এবং তাদের অজ্ঞাতসারেই খেলার সাহায্যে তাদের দেহ ও মন স‌ুগঠিত হয়ে ওঠে। নানাবিধ অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে তাদের পেশী এবং স্নায়‌ুগ‌ুলি প‌ুষ্টিলাভ করে। তারা নানাভাবে হাত পা প্রভৃতি প্রত্যঙ্গগ‌ুলিকে ব্যবহার করবার ক্ষমতা অর্জন করে। চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ‌ুলি রীতিমত ব্যবহার করার ফলে পরিপ‌ূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন রঙ, র‌ূপ, গন্ধ, রস প্রভৃতির অভিজ্ঞতা হয়। বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে ভাল ভাবে ধারণা জন্মায়। দিক, দ‌ূরত্ব প্রভৃতির অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উন্ম‌ুক্ত মাঠ প্রচুর স‌ূর্যালোক ও পর্যাপ্ত বাতাসের মধ্যে খেলাধ‌ুলা করার ফলে শিশ‌ুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। মনের প্রফ‌ুল্লতা বাড়ে। শিশ‌ুদের নানারকম আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা খেলার মধ্যে চরিতার্থ হয়। তাদের কল্পনা খেলার ভেতর র‌ূপলাভ করে। খেলার মধ্যে দিয়ে শিশ‌ুদের কৌত‌ূহলও যেমন মেটে তেমনি আবার তাদের অন‌ুকরণ করার ইচ্ছাবৃত্তি সাধন করারও স‌ুযোগ যথেষ্ট ঘটে। এক সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার জন্য তাদের মধ্যে সমাজ-চেতনার সঞ্চার হয়। একজন অপরজনের কথা ভাবতে শেখে এবং দলের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করবার শিক্ষালাভ করে। এক কথায় খেলা-ধ‌ুলার মধ্য দিয়ে শিশ‌ুর দেহ এবং মনের বিকাশ সম্পন্ন হয় এবং ভবিষ্যতের জন্যে উপয‌ুক্ত হয়ে সে গড়ে ওঠে। স‌ুতরাং শিশ‌ুর খেলাধ‌ুলার প্রতি প্রত্যেক মাতাপিতারই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিশ‌ুর বয়সোপযোগী খেলাধ‌ুলার আয়োজন করা এবং খেলা করতে শিশ‌ুকে

উৎসাহিত করা সকল অভিভাবকেরই নিতান্ত করণীয় কাজ।

এক বছরের ছোট যে সব শিশু, তারা সাধারণত হাতপা ছুঁড়ে মাথা ঘুরিয়ে, চোখ কান ফিরিয়ে খেলা করে। আগেই বলেছি তাদের ওপর একরাশ জামা কাপড় চাপিয়ে তাদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অঙ্গ সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি করা একেবারেই সমীচীন নয়। প্রায় এক বছরের সময়, শিশুরা যখন হামাগুড়ি দিতে এবং হাঁটতে শেখে তখন এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকা তাদের পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরা যাতে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারে সেজন্য কোন একটা ঘর অথবা কোন একটা নিরাপদ অথচ উন্মুক্ত জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এবং নানান রকমের হাল্‌কা ছোট-খাটো সামগ্রী (যেমন চুষি, কাগজের ফুল, কমলালেবু, কৌটা, ডিবা ইত্যাদি) তার চার পাশে ছড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে ক'রে সে তার চোখ, কান, হাত পা ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারে। বছর দুই বয়স হ'লে শিশুর জন্য নানারকমের খেলনা এনে দিতে হবে এবং সেগুলি রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা দিতে হবে তাকে। সে যেন ইচ্ছে করলে খেলনাগুলো ব্যবহার করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এরপর ঘরের ক্ষুদ্র গন্ডী যখন মনকে বেঁধে রাখতে পারবে না তখন গৃহ-সংলগ্ন অঙ্গণে বা উদ্যানে তার খেলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই সব খেলার প্রাঙ্গণ বা মাঠে সূর্যের আলোক, মুক্ত বাতাস এবং গাছের স্নিগ্ধ ছায়া যদি থাকে, তাহলে শিশুর স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করবার সুযোগ পাবে। সুতরাং যতদূর সম্ভব শিশুর ক্রীড়াভূমিতে আলো, ছায়া, আর বাতাসের আয়োজন করা দরকার। শিশু যতো বড়ো হবে ততো তার খেলার ধরণ যাবে পাল্‌টে। যে শিশুটি একদিন হাত-পা ছুঁড়ে আনন্দ পেতো, সে আজ দৌড়াদৌড়ি ক'রতে, লাফঝাঁপ দিতে, দোলায় দুলতে, ঘাসের ওপর ডিগবাজি খেতে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মাটির ওপর পিছলে পড়তে ভালবাসে। আরও যারা বড়ো তারা ঘুড়ি ওড়াতে, তিনচাকা সাইকেল চড়ে ছুটে বেড়াতে, লুকোচুরি খেলতে, গাছে

চড়তে বেশী ভালবাসে। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দেহের যতো পুষ্টি ঘটে খেলাধূলার জটিলতাও ততো বেড়ে যায়। যারা ছোট তারা খেলাধূলায় স্বাধীনতাটা বেশী পছন্দ করে অর্থাৎ খেলার ভেতর কোন রকম কড়া নিয়ম মেনে চলতে তারা একেবারেই রাজী নয়। কিন্তু যারা বড়ো তারা খেলার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ধারা মেনে চলতে উৎসুক। সুতরাং কোন্ কোন্ শিশুর খেলাধূলার ধরণ কী রকম হবে, সেটা নির্ভর করছে তাদের বয়সের ওপর। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে বয়েসটাই এক্ষেত্রে সব নয়। দেহ এবং মনের পুষ্টি কী রকম প্রধানতঃ তারই ওপর নির্ভর করে একটি বিশেষ শিশুর কী ধরনের খেলাধূলার প্রয়োজন। বয়সে ছোট হলেও তার মনের বিকাশ খুব উন্নত ধরনের হতে পারে, আবার দেহের খুব পুষ্টি হলে মনেরও যে তেমনি পুষ্টি হবে সে কথাও ঠিক নয়। শিশুকে যত্ন-সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে এবং মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে মাতাপিতা তাঁদের শিশুর দেহমনের কী রকম পুষ্টি সাধিত হয়েছে সেটা বুঝতে পারবেন।

শিশুরা বড়োদের যা করতে দেখে নিজেরা খেলাধূলার ভেতর সেই সব ক'রে থাকে। পুতুল খেলার ভেতর দিয়ে শিশুরা মা, বাবা, দাদা, বৌদি ইত্যাদি চরিত্রের অভিনয় করে। তার নিজের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে খেলার ভেতর দিয়ে। কোন বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে শিশু তার পুতুলের বিয়ে দিতে বসে। বয়স যতো বাড়তে থাকে শিশুর খেলায় কল্পনার স্থান ততো বেশী হয়। বেদুইনের গল্প শুনে একটা লাঠির গোছাকে উট খাড়া ক'রে সে কল্পিত মরুভূমি অতিক্রম ক'রে যায়। কাগজ কেটে নানা রকমের ফুল, ফল, পাতা, পাখি জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে। তাদের এই সব কল্পনাকে বিকশিত ক'রে তোলার চেষ্টা সকল মাতাপিতারই করা দরকার। নানান রকমের রঙীন কাগজ, রঙ, তুলি প্রভৃতি ছবি আঁকার উপকরণ, ভোঁতা কাঁচি, ছুরি, নরম মাটি, নানান আকারের কাঠের টুকরো প্রভৃতি 'অতি

সহজলভ্য সামগ্রীগুলি শিশুদের যদি দেওয়া হয় তাহলে ছবি এঁকে, নক্সা ক'রে, পুতুল গড়ে, ফুল কেটে ইচ্ছে মতো তারা নিজের নিজের কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে সক্ষম হবে।

খেলার সংগী

অনেক মাতাপিতা আপন শিশুকে অন্য কোন ছেলেমেয়ের সংগে খেলাধূলো করতে দেন না। তাঁদের ভয় পাছে সে মন্দ হয়ে যায়। তাই তাঁরা তাঁদের স্নেহ-আঁচলের আড়ালে শিশুটিকে অন্য সবার থেকে আগলে রাখতে চান। এর ফলে শিশুর মনে সমাজ-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারে না। লোকজনের সংগে মেলামেশা করবার, নতুন পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার কোনদিনই হয় না। সে আত্ম-কেন্দ্রিক, অভিমানী এবং ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। নিজের সুখ দুঃখ নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকে, অতি সহজে ভেঙে পড়ে এবং বাস্তব জগত হতে বিদায় নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। কল্পনাপ্রিয়তা অতিমাত্রায় বেড়ে উঠলে তার মধ্যে নানারকম মানসিক ব্যাধিরও উৎপত্তি ঘটতে পারে। সুতরাং আপন আপন শিশুকে আর পাঁচজন শিশুর সংগে মিলে মিশে খেলা করতে উৎসাহিত করা সকল মাতাপিতারই কর্তব্য। অন্যথায় তাঁরা নিজের হাতেই নিজের স্নেহ পুত্তলিটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলবেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর সংগী নির্বাচন করা খুব সোজা কাজ নয়। যে সব শিশুর দেহ এবং মনের পুষ্টি প্রায় একই রকম, অর্থাৎ সাধারণত যাদের মধ্যে বয়সের তারতম্য খুব নাই তারা যদি একসংগে খেলাধুলা করবার সুযোগ পায় তাহলে অত্যন্ত আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়। সংগীদের বয়েস যদি খুব বেশী হয় তাহলে খেলার প্রকৃতিটা অন্য রকমের হবে। তার ফলে শিশুর দেহ ও মনের ওপর চাপ পড়বে খুব বেশী। তাছাড়া বড়রা সব সময়ই তার ওপর কর্তৃত্ব করার ফলে শিশুর

আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি ব্যাহত হবে, তার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবার এবং চিন্তা করবার শক্তি জাগবে না। পক্ষান্তরে তার সঙ্গীরা যদি তার চাইতে খুব বেশী ছোট হয় তাহলে সে আত্মশক্তিতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে সকল ক্ষেত্রেই প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে—বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি তার মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে না। শিশুর সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে খুব সতর্কতা সহকারে। খেলার সঙ্গীদের মধ্যে যদি ঝগড়া-ঝাটি হয় তাহলে অভিভাবক যেন কোন একটি বিশেষ শিশুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করেন। অনেক সময় সমস্ত ঘটনাটা না জেনেই মাতাপিতা তাঁদের নিজের শিশুর পক্ষ নিয়ে অন্য শিশুদের তাড়না করেন। শিশুমনে এর রীতিমত প্রতিক্রিয়া হয়। শিশু তার মাতাপিতাকে ভালোমন্দ সকল কাজেই তার সমর্থক ব'লে ভাবতে শেখে এবং তার মধ্যে নীতিজ্ঞান ঠিকমতো বিকাশলাভ করে না। ঝগড়াঝাটির যথার্থ কারণ নির্ণয় ক'রে সেটিকে দূর করবার চেষ্টাই করতে হবে এসব ক্ষেত্রে।

অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার যেমন প্রয়োজন আছে শিশুর, তেমনি আবার একা একা খেলা করারও তার দরকার আছে। নির্জনতাকে ভালবাসতে না শিখলে একাগ্রতা শিক্ষা হয় না। একাগ্রতার অভাব ঘটলে কাব্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং মাতাপিতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন প্রতিদিন কিছুক্ষণ একাকী থাকতে শেখে। ভালো ভালো গল্পের বই, ছবির বই পড়তে দিলে, গান গাওয়া শেখালে, ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করতে পারলে শিশু এই সব দিয়ে তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে কাজে আর আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারবে। তার কল্পনাশক্তি প্রখর হবে। একাগ্রতার গভীরতা বাড়বে। সৃষ্টি করবার মতো মানসিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে সে। সুতরাং শিশুকে নিঃসঙ্গ অবকাশ দেবার আয়োজন করতে হবে সকলকে।

খেলা

শিশুর বিচিত্র খেলাধুলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যের উত্থাপন করা হয়। একদল চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক মনে করেন জীবন ধারণের জন্য শিশুদের বিশেষ কোন চেষ্টা করতে হয় না, মাতাপিতা ও অপরাপর অভিভাবকেরা তাদের লালনপালন ও ভরণপোষণ ক'রে থাকেন; তাই শিশুর প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি বিভিন্ন ক্রীড়ার আকারে উৎসারিত হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত স্পেন্সার এই মতাবলম্বীদের অন্যতম। অপরপক্ষে গ্রুজ্ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ধারণা শিশু খেলাধুলার মধ্য দিয়ে নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তোলে। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারের ফলে তার দেহ সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। শিশু মাতাপিতা ও অপরাপর ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় ক'রে ভাবীকালের সমাজ জীবনের উপযুক্ত ক'রে নিজেকে তৈরী করতে থাকে। অবশ্যই এ সব কাজ সে জ্ঞানতঃ করে না। আর একদল বৈজ্ঞানিক একটু নূতন ধরনে চিন্তা করেন। এঁদের বলে মনঃসমীক্ষক। এঁরা মনে করেন শিশু, বিশেষতঃ যে শিশু একটু বড়ো সে খেলার ভেতর দিয়ে তার অপূর্ণ ইচ্ছারাশিকে চরিতার্থ ক'রে থাকে। যে শিশুটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা রীতিমত না করার জন্য প্রতিদিন শিক্ষকের কাছে তিরস্কৃত হয় সে খেলার মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে অপরাপর শিশুদের তিরস্কার ক'রে শিক্ষকের প্রতি তার যে আক্রোশ সেটা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে। পিতার মতো কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা যে শিশুর মনে প্রবল সে খেলার মধ্যে পিতার চরিত্র অভিনয় ক'রে তৃপ্তিলাভ করে। বলা বাহুল্য উপরোক্ত কোন একটি তথ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সকলের মধ্যেই সত্য আংশিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শৈশবের বিভিন্ন স্তরের খেলাধুলাকে কোন একটি-মাত্র তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি তথ্য প্রযোজ্য মাত্র।

শিশুর ভালবাসা

ভালবাসার দুটো দিক আছে। ভালবাসার বস্তু (বা ব্যক্তি) এবং ভালবাসার অনুভূতি। শিশুর ভালবাসার প্রথম ব্যক্তিটি হলেন মা। সর্বপ্রথমে মাকে শিশু কেন ভালবাসতে শেখে তার কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ মা শিশুকে ক্ষুধার সময় স্তন্যদান করেন, তার যত্ন নেন, তাকে স্নান করিয়ে দেন, ঘুম পাড়ান ইত্যাদি, এক কথায় তার জৈবিক প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ স্তন্যপান কালে শিশুর ওষ্ঠে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার ফলে শিশু নিবিড় আনন্দের অনুভূতি আস্বাদন করে। মায়ের সুগভীর আলিঙ্গনে, সাদর চুম্বনেও আনন্দানুভূতি তার সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়ে তাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। তাই শিশুর কাছে আনন্দ এবং মা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মা হয়ে ওঠেন আনন্দময়ী। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই তার ভালবাসা আরও অনেক বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি সঞ্চারিত হয়। যে তাকে আদর করে, যে তাকে সাহায্য করে, যা কিছু তাকে আনন্দ দেয় তারই প্রতি তার ভালবাসা জাগ্রত হয়। শিশু যত বড় হয় ততই তার মধ্যে বিভিন্ন প্রেরণার উন্মেষ হয়। সঙ্গ-প্রীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এইসব প্রেরণার অন্যতম। তার এই নবোন্মেষিত প্রেরণারাশি যার বা যা কিছুর দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় তাকেই শিশু ভালবাসতে শেখে। সাধারণত শিশু মার পর যাকে বেশী ভালবাসে সে হলো তারই সমলিঙ্গ আর একটি শিশু। অর্থাৎ শিশুটি যদি মেয়ে হয় তাহেল সে তারই মতো আর একটি মেয়েকে ভালোবাসে এবং সে যদি ছেলে হয় তাহলে তারই মতো আর একটি ছেলের প্রতি তার ভালবাসা প্রধাবিত হয়ে থাকে। যৌবনোদ্গমে তার ভালবাসা ভিন্নমুখী হয় অর্থাৎ ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে ছেলেকে ভালবাসতে সুরু করে। এইটে হলো ভালবাসার সাধারণ ধারা। কিন্তু ধারাটা যেমন সরল মনে হলো আসলে এটা তেমন সরল নয়। তার কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পরিচিতির গণ্ডী ধীরে ধীরে

প্রসারিত হয় এবং তার বন্ধ্ুসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করে। সে যাকে ভালবাসে তাকে সব সময়ই ভালবাসতে পারে না। কারণ তার ভালবাসার ব্যক্তিটি সব সময়ই তাকে সাহায্য করে না, অনেক সময় বাধাদানও করে। শিশ্ুর সকল কাজই সব সময় তার ভালবাসার ব্যক্তিটির অন্ুমোদন লাভ করে না। তাই ভালবাসার রাজ্যে ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিরক্তি, ঈর্ষা, আক্রোশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিপরীত অন্ুভূতিগ্ুলি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ওঠে। এমনি করে ভালবাসার অন্ুভূতিটা জটিল হ'য়ে পড়ে।

প্রধানতঃ শিশ্ুর ভালবাসার উৎপত্তি স্তন্যপানকালে তার ওষ্ঠসঞ্জাত উত্তেজনায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের আরো অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্ুর্ূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। শিশ্ু যখন মাকে কাছে পায় না, তখন তার নিজের বৃদ্ধাঙ্গ্ুষ্ঠ লেহন ক'রে আপন ওষ্ঠকে উত্তেজিত করে। ক্রমে ক্রমে তার পায়্ু ও জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা আনন্দ দান করতে সক্ষম হয়। প্রথমে ভালবাসা থাকে দেহগত, তার সম্ূহ অঙ্গের উত্তেজনা, বিশেষতঃ কতকগ্ুলি প্রত্যঙ্গের উত্তেজনা শিশ্ুকে আনন্দদান করে। তারপর যখন তার মানসিক প্রেরণাগ্ুলি প্ুষ্টিলাভ করে তখন তার আনন্দান্ুভূতির কেন্দ্রটি দেহ ছাড়িয়ে মনের মধ্যেও বিস্তারলাভ করে। ভালবাসার ক্রমবিকাশ ঘটে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে। দেহের প্ুষ্টি এবং মনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার প্রকৃতি ও ভালবাসার বস্তুর বিভিন্নতা ঘটে। শিশ্ু তখন অনেককে এবং অনেক কিছ্ুকে ভালবাসতে শেখে। অনেক বিষয়কে, অনেক বস্তুকে ভালবাসে। আদর্শকে ভালবাসে। সকলকে সমানভাবে ভালবাসে না। একইজনকে সব সময়ই ভালবাসে না— কোন সময় ভালবাসে, কোন সময় ঘৃণা করে। যে কাজে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে সে কাজ করতে ভালবাসে। যে কাজ করতে অক্ষম হয়, সে কাজ করতে ভয় পায় কিংবা আগ্রহ পায় না। অন্যের দেখাদেখি (বিশেষ ক'রে যাদের সে ভালবাসে তাদের) অনেক কিছ্ুকে ভালবাসতে শেখে। তার ভালবাসার ব্যক্তিটির মতো র্ূপগ্ুণের

অধিকারী অন্য ব্যক্তিদের পছন্দ করে। এই রকম ছোটবড় অনেক কারণে তার ভালবাসা ধীরে ধীরে জটিলতা লাভ করে।

শিশুর কৌতূহল

শিশু যতো বয়সে বেড়ে ওঠে, ততো তার বুদ্ধি ওঠে বেড়ে। সে ততোই তার চারিপাশের বিশ্বজগত সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। অজস্র প্রশ্ন তার মনের ভেতর ভিড় ক'রে আসে। চারিপাশে যাঁরা থাকেন তাঁদের সহস্র প্রশ্ন ক'রে সে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। তার অধিকাংশ প্রশ্নই বড়দের কাছে আজব ঠেকে, অদ্ভুত মনে হয়। অনেক সময় বড়োরা সে সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বলে থাকেন—তোমার এসব কথা জানবার বয়েস এখনও হয় নি, বড়ো হও তাহলেই সব বুঝতে পারবে। কিন্তু শিশুর মন তৃপ্ত হয় না। বার বার নিরাশ হলে তার বুদ্ধির উন্মেষ স্তব্ধ হয়ে আসে। জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা যায় কমে। তাই যতোদূর সম্ভব শিশুদের প্রশ্নকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হবে। সদুত্তর দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

শিশু সাধারণত জ্ঞান আহরণের জন্য তার বিকচমান ইন্দ্রিয়-গুলির ওপর নির্ভর করে। ঘরের বাইরে কুকুর ডেকে উঠলে, রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে গেলে, কিচির মিচির করে পাখি ডেকে উঠলে সেদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফুলের গাছে কুঁড়ি ধরলে, ফুল ফুটলে, আকাশের মেঘে রঙ লাগলে তার লক্ষ্য এড়ায় না। যেসব শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিকে আমরা অহরহ উপেক্ষা করে চলি সেগুলিও শিশুর মনকে আকর্ষণ করে। সব কিছুর অর্থ আবিষ্কার করার জন্য তার মনে অদম্য কৌতূহল জেগে ওঠে। কম্বল গরম কেন, ভেড়ার গায়ে এতো লোম কেন, ফুলের গায়ে বিচিত্র রঙ কেন, সূর্যাস্তের মেঘ রাঙা কেন, আকাশের রঙ নীল কেন, গান মিষ্টি কেন, চিনি মধুর কেন, পাখি ডাকে কেন ইত্যাদি সহস্র সহস্র প্রশ্ন তাকে বিমুগ্ধ করে। যে শিশু যতো বেশি প্রশ্ন করে তার মনের বিকাশ

ততো বেশি এটা বুঝতে হবে। কিন্তু শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় মনে রাখতে হবে যেন উত্তরটা তার বোধগম্য হয়।

অনেক সময় শিশুদের প্রশ্নগুলি মাতাপিতার নীতিবোধকে আঘাত করে। তাঁরা অস্বাভাবিকভাবে রাগ করে থাকেন। এইসব প্রশ্ন করার জন্য শিশুকে তাড়না করেন, অনেক শাসন করে থাকেন। এই রকম আচরণ করার ফলে প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল সহস্রগুণ বেড়ে ওঠে। যতো বাধা পায় ততোই তার আগ্রহ বেড়ে যায়। ছেলেমেয়ের দেহগত পার্থক্য, সন্তান-জন্মের রহস্য ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নকে মাতাপিতা অপরাপর প্রশ্নের মতো সহজ ক'রে গ্রহণ করতে পারেন না। এসব বিষয়েই সে অধিকমাত্রায় উৎসুক হয়ে ওঠে এবং নানা জায়গা থেকে নানা রকমের কুৎসিত কুরুচিসম্পন্ন ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে। মাতাপিতা যদি অতি সহজভাবে এই সব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদুত্তর দেবার চেষ্টা করেন তাহলে শিশুদের কৌতূহল চরিতার্থ হবে। অনেক সময় শিশুরা বার বার একই রকম প্রশ্ন করলে মাতাপিতা তার নীতিবোধ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এটা কিন্তু অত্যন্ত ভুল। শিশুরা স্বভাবতঃই সেই সব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে যেগুলির সঙ্গে শুধু জ্ঞানপিপাসা জড়িত থাকে, যেগুলিতে কোনরকম আবেগের রঙ লাগে না। ফুল কি করে ফোটে এ প্রশ্ন শিশু করে তার জানবার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাতাপিতা কোনরকম ইতস্তত বোধ করেন না। সহজভাবে উত্তর দেন, তারও তাই একে ঘিরে কোন রকম আবেগের সঞ্চার হতে পারে না। উত্তরটা শুনলে শিশু সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট হয় কিন্তু আরও অনেক দিকে তার মন চলে যাবার জন্য সে সহজে একথা ভুলে যায় এবং পুনরায় এই প্রশ্নই করে। কিন্তু আমার নতুন বোনটা কোথায় ছিলো, কী ক'রে হলো, জন্মালো কেমন ক'রে ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন ক'রে শিশু যখন তাড়না খায় তখন তার মন বেশি ক'রে এই দিকেই আকৃষ্ট হয়। এই সব প্রশ্ন তার মনের ভেতর বেশির ভাগ সময়ই ঘোরাফেরা করে। এগুলির বিষয়ে তার

মনের ভাব আর সহজ থাকে না। কিন্তু তাড়না ও শাসনের ভয়ে পুনরায় সে মাতাপিতাকে এই সব প্রশ্ন করা থেকে নিরস্ত থাকে। শিশু যখন তার জন্মবৃত্তান্ত মার কাছে জানতে চায় তখন তিনি বড়ো মুশকিলে পড়েন। রূঢ় সত্য কথাটা তাকে বলা চলে না, সে কথা বুঝবার তার শক্তিও নাই। অথচ কিছু একটা বলা চাই এবং সেটা যতোদূর সম্ভব সত্য হয় ততোই ভালো। কিছু না বললে সে তৃপ্ত হবে না। তিরস্কার করলে এ বিষয়ে তার অস্বাভাবিকভাবে কৌতূহল বেড়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে বলা চলতে পারে—তুই আমার পেটের ভেতর ছিলি, তারপর বড়োসড়ো হয়ে বেরিয়ে এসেছিস। যদি বলে—কী করে বেরিয়ে এলুম, তাহলে বলা যেতে পারে—পেট কেটে। আবার প্রশ্ন করতে পারে শিশু—পেটে কাটা কোথায়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে—কাটা জুটে গেছে ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয়, এইটাই শিশুর পক্ষে সবচেয়ে সহজবোধ্য উত্তর এবং পরিপূর্ণ সত্য না হলেও এর মধ্যে সত্যের অপলাপ খুব কম আছে।

অনেক সময় শিশুরা নিজেদের এবং সঙ্গী-সাথীদের জননেন্দ্রিয় সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করে থাকে। এতে বিচলিত হবার কিছুই নাই। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো এই বিশেষ অঙ্গটি সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর ওপর বেশি দৃষ্টি দিলে এ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহলকে আরো বাড়িয়েই দেওয়া হবে, সুতরাং এদিকে খুব বেশি দৃষ্টি দেবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

ইজের বা কাপড় পরা না থাকলে অনেক সময় মাতাপিতা শিশুকে বকাবকি করেন। এর ফলে তাদের দৃষ্টি একটা বিশেষ দিকে ধাবিত হয়। কৌতূহল বেড়ে ওঠে। তাকে তাড়না না ক'রে 'বেড়ু' করতে যাবার নাম করে যদি ইজের বা কাপড় পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার নগ্নতা ঢাকার এই আয়োজন সম্বন্ধে সে কিছুই জানবে না অথচ অতি সহজে তার মধ্যে সমাজ-চেতনার উন্মেষ করা সম্ভব হবে। মোটের উপর অপরাপর বিষয়ের মতো মাতাপিতাদের যৌন বিষয়টাকেও অত্যন্ত সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

শিশুর শিক্ষা

শিক্ষার অন্ত নাই। মানুষ জন্ম মুহূর্ত থেকে সুরু করে মৃত্যু বরণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু শৈশব সময়ে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে তার বিচিত্রতা এবং দ্রুততা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। যে শিশুটি কিছুকাল আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিনরাত্রি কাটাতো, সে ক্রমে ক্রমে বসতে. হামাগুড়ি দিতে, হাঁটতে, হাত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী ধরতে, কথা বলতে, খেলা করতে শিখেছে। প্রতি মুহূর্তে সে নতুন নতুন কার্যকলাপ সম্পাদন করবার ক্ষমতা ও কৌশল আয়ত্ত করেছে। এইসব কাজ আমাদের কাছে অতি সহজ মনে হলেও এগুলি আয়ত্ত করা এত সহজ ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল দেহ এবং মনের অত্যন্ত জটিল পরিপুষ্টির। স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ না ঘটলে এগুলো আয়ত্ত করা কখনই সম্ভব হ'ত না।

শিক্ষা বহু বিচিত্র হলেও প্রধানতঃ তাকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ ইন্দ্রিয়-শিক্ষা, পৈশীক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা এবং মানসিক শিক্ষা। শিশু যে সব ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলিকে আয়ত্ত করার জন্য এবং যথাযথভাবে সেগুলিকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট ক'রে তোলার জন্য সেগুলির চালনা ও ব্যবহারের দরকার। চারিপাশের অজস্র রূপ, রঙ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ইত্যাদি শিশুকে প্রতিদিন গভীরতরভাবে আকর্ষণ করে তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিপুষ্ট করে তোলে এবং শিশু প্রতি মুহূর্তে এই সব ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার ক'রে সেগুলিকে আয়ত্ত করতে শেখে। চারিপাশের বিচিত্র বস্তুকে শিশু নাড়াচাড়া করে. দিকে দিকে ছুটাছুটি ক'রে সে তার অপরিসীম

কৌতূহলকে চরিতার্থ করে এবং তার অজ্ঞাতেই বিভিন্ন পেশীর ওপর তার অধিকার জন্মায়। শিশু যতো বড় হতে থাকে ততোই সমাজের প্রভাব তার ওপর বেশি করে বিস্তারিত হয়। সে সমাজের ভয়ে ও প্ররোচনায় নিজের মনের অনেক গোপন প্রেরণাকে সংযত করতে শেখে। ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে ওঠে। শিশু যতো বড় হতে থাকে ততোই তার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণতর হয়ে ওঠে, তার বুদ্ধিশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার বুদ্ধির বিকাশকে দ্রুততর করে তোলে এবং শিশু তার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বুদ্ধির প্রয়োগ করতে শেখে।

শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বানর, কুকুর, বিড়াল, খরগোস, মুরগী, পায়রা ইত্যাদি উন্নত ধরনের পশুপক্ষি এবং মানবশিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি-গণের ওপর নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে পণ্ডিতেরা নানা প্রকার শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করেছেন। প্রধান প্রধান প্রণালীগুলি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঠেকে শেখা ঃ পশুপক্ষী তো দূরের কথা মানুষই অনেক সময় ঠেকে শেখে। যখন কোন জটিল সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তার সমাধানের জন্য অন্ধের মতো নানারূপে চেষ্টা ক'রে থাকি। আমাদের তখনকার আচরণকে "নির্বোধের আচরণ"ও বলা যেতে পারে। একটা চেষ্টা ব্যর্থ হলে আর একটা নতুন উপায় অবলম্বন ক'রে আমরা সমাধানের জন্য নতুন চেষ্টা করি। দৈবাৎ কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টার বিরাম থাকে না। এইরূপ ঠেকে শেখার উদাহরণ মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে দেখা যায়। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার ভেতর আবদ্ধ ক'রে খাঁচার বাইরে যদি খাবার সামগ্রী রাখা যায়, তাহলে জানোয়ারটা খাবারের কাছে আসার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠবে। বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাবার আশায় সে অন্ধের মতো খাঁচাটার বিভিন্ন অংশকে আক্রমণ করবে। দাঁত দিয়ে এটা কামড়াবে, নখর দিয়ে ওটাকে বিদীর্ণ করার চেষ্টা করবে। এইরূপ অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রম করতে করতে

অকস্মাৎ যদি খাঁচার খিলটাকে খুলে ফেলতে সমর্থ হয়, তাহলে মুহূর্ত মধ্যে খাবারের কাছে ছুটে গিয়ে বিড়ালটা তার ক্ষুধা নিবৃত্ত ক'রে অপরিসীম আনন্দ লাভ করবে। দ্বিতীয়বার যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিড়ালটাকে খাঁচায় ভরা যায় তাহলে এবারও সে অনেক অনাবশ্যক শ্রম করবে ঠিকই, কিন্তু প্রথমবারে খিল খুলে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে তার যে সময় লেগেছিল, এবার তার চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ আগে সে বাইরে আসবে। তৃতীয়বারে খাঁচা থেকে বাইরে আসতে তার আরও কম সময় লাগবে। বার বার এইরূপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে খাঁচায় ভরা মাত্রই প্রাণীটা খাঁচা খুলে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, বিড়ালটা প্রথম প্রথম ঠেকে ঠেকে শিখেছিল, কিন্তু যতো সময় অতিবাহিত হতে লাগল, ততই সে বেদরকারী আচরণগুলোকে পরিত্যাগ ক'রে দরকারী আচরণগুলোকে আয়ত্ত করতে শিখলো, অনাবশ্যক শ্রম ত্যাগ ক'রে সে শুধু আবশ্যক মত শক্তি ব্যয় করতে নিপুণ হয়ে উঠল।

পণ্ডিতপ্রবর থর্নডাইক মনে করেন, ঠেকে শেখার প্রণালীটা দুটি সূত্র অনুসরণ ক'রে চলে। প্রথম সূত্রটির নাম অনুশীলন সূত্র, দ্বিতীয়টির নাম পরিণতি সূত্র। অনুশীলন-সূত্র অনুসারে যে কাজটি যত বেশীবার সম্পাদন করা হয়, সে কাজটি ততো বেশী সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এবং যে কাজটি সম্প্রতি সম্পাদিত হয়েছে, সেটি বহু পূর্বে নিষ্পন্ন কোন কাজের চেয়ে অধিকতর সহজে পুনরায় সম্পন্ন করা সম্ভব। অনুশীলন-সূত্রের কার্যকরিতা সম্বন্ধে বহু উদাহরণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় অর্থাৎ কোন একটা নূতন কাজ শিক্ষা করতে হলে বার বার সেটা সম্পাদন করা এবং মাঝে মাঝে তার অনুশীলন করার দরকার আছে একথাটা বহুলাংশে সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে সত্য নয়। যেমন বিড়াল নিয়ে যে পরীক্ষাটার কথা আগে বলা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে বিড়ালটা যতবার খাঁচার খিলটা খুলেছে তার

চাইতে অনেক বেশী বার সে অনেক ভুল করেছে; কিন্তু বার বার সম্পাদিত হয়েও এই ভুলগুলো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, পক্ষান্তরে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত এবং অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছে। প্রথম সূত্রটির উক্ত ব্যতিক্রম লক্ষ্য ক'রে থর্নডাইক দ্বিতীয় সূত্রটির অবতারণা করেন। পরিণতি সূত্র অনুযায়ী যে কাজের পরিণতি সন্তোষজনক সে কাজ করার ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং যে কাজের পরিণতি যন্ত্রণাদায়ক সেটিকে আমরা পরিহার করি। এই কারণে বার বার অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ভ্রান্ত আচরণগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি, পক্ষান্তরে সার্থক আচরণগুলি অল্প কয়েকবার সম্পাদিত হয়েও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিণতি-সূত্রটি যে বহুক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এ কথা সন্দেহাতীত। শাস্তির ভয়ে আমরা অনেক কাজ করা থেকে বিরত হই এবং পুরস্কারের লোভে অনেক কাজ শিক্ষা করার প্রেরণা লাভ করি। কিন্তু এই সূত্রটিকে সর্বান্তঃকরণে অনেকেই মেনে নেননি। অনেকেই এর বিরোধী সমালোচনা করেছেন এবং এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সব সমালোচকেরা উপরোক্ত পরীক্ষাটির কথা উল্লেখ ক'রে বলেন, বিড়ালটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার পরেই খাদ্যবস্তুটি গ্রহণ ক'রে আনন্দলাভ করে না, তাকে খাবারের কাছে ছুটে যেতে হয়, তারপর খাবার মুখে দিতে হয়, তারপর খাদ্যবস্তুটিকে চর্বণ লেহন করতে হয়, তখন সে আনন্দের স্বাদ পায়। সুতরাং খাঁচা হতে মুক্তিলাভ এবং খাদ্য গ্রহণের আনন্দ এ দুয়ের মাঝখানে আরও অনেক টুকরো টুকরো আচার আচরণ রয়েছে। পরিণতি-সূত্র অনুযায়ী যে কাজ সন্তোষ দান করে, তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং এক্ষেত্রে খাদ্যবস্তু চর্বণ বা লেহন ক্রিয়াটিই প্রতিষ্ঠিত হবার কথা; কারণ এটির সঙ্গেই আনন্দ বিজড়িত আছে, খাঁচা থেকে মুক্তিলাভের ক্রিয়াটির সঙ্গে এই আনন্দের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, সেটি বহু পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গেছে. সুতরাং এই ক্রিয়াটির প্রতিষ্ঠা লাভের

কোন কথাই উঠতে পারে না। তা ছাড়া তাঁরা আরও একটি জটিলতর পরীক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন ক'রে থাকেন। কতকগুলো পরীক্ষায় খাঁচাটাকে আরও জটিল করা হয়েছে। এই খাঁচায় দুটো পৃথক কুঠরী তৈরী করা হয় এবং দুটি কুঠরী থেকে মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ দুটি স্বতন্ত্র খিল ব্যবহার করতে হয়। জন্তুটি বহু অনাবশ্যক পরিশ্রম করার পর দৈবাৎ প্রথম কুঠরীটি থেকে মুক্তিলাভ করে, কিন্তু এর পরই সে খাবারের কাছে পৌঁছতে পারে না। দ্বিতীয় কুঠরী হতে অকস্মাৎ মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত তাকে আরও অনেক অযথা শ্রম করতে হয়। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় কুঠুরী হতে বাইরে আসার জন্য যে দুটি উপযোগী কৌশল আছে তাদের মধ্যে ব্যবধানটা খুব বেশী, অনেক নিরর্থক প্রচেষ্টায় সমাকীর্ণ। এক্ষেত্রে খাদ্যসঞ্জাত আনন্দ দিয়ে এই দুটি অত্যাবশ্যক ক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হাস্যকর, কারণ যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করলে অনুপযোগী আচরণগুলিরই প্রতিষ্ঠা লাভের কথা। প্রথম দৃষ্টিতে বিপক্ষ সমালোচকদের কথাটাকে ঠিক মনে হয় বটে, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এই যুক্তিটার অসারত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। প্রথম কথা, এক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের আনন্দ ব্যতীত আরও একটা যে আনন্দ আছে, সে কথা সমালোচকেরা ভুলে গেছেন। প্রাণী মাত্রই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার পক্ষপাতী। একটা সুস্থ স্বাভাবিক জন্তুকে খাঁচার ভেতরে বন্দী ক'রে রাখলে সে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মুক্তিই তার আনন্দ। এইটাই মুখ্য আনন্দ, খাবারের আনন্দটা গৌণ। সুতরাং প্রথম কুঠরী থেকে বেরিয়েই প্রাণীটা আনন্দ লাভ করে এবং এই আনন্দই তাকে মুক্তির কৌশলটা আয়ত্ত করতে সমর্থ করে। দ্বিতীয় কুঠরীতে সে যখন আসে তখন তার সম্মুখে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং নতুন একটা সমস্যা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বার বন্দিত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার সমস্যা। এখানেও মুক্তি তার আনন্দ এবং এই আনন্দের আস্বাদন যখন সে পায়, তখন কৌশলটা তার আয়ত্ত হয়ে

পড়ে। দ্বিতীয়তঃ মুক্তিলাভের এত অল্পক্ষণ পরে বিড়ালটির ক্ষুন্নিবৃত্তির আনন্দ ও আহারের আনন্দের যে অভিজ্ঞতা ঘটে, তাকে একটি মাত্র অভিজ্ঞতাই বলা চলে, তার মধ্যে টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার কথা তোলা নিষ্প্রয়োজন। অতএব পরিণতি-সূত্রকে স্বীকার ক'রে নেওয়া যুক্তিবিগর্হিত হবে না।

দেখে শেখা ঃ শিক্ষালাভের দ্বিতীয় প্রণালীর নাম দেখে শেখা অর্থাৎ অন্যকে অনুকরণ ক'রে কোন কিছু শিক্ষালাভ করা। মানুষ এবং অধিকাংশ জীবজন্তুর মধ্যে এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে। পশুপাখির শাবকেরা তাদের জনকজননীকে অনুকরণ ক'রে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার এবং খাদ্য সংগ্রহ করার শিক্ষালাভ করে। মানবশিশু বয়স্কদের অনুকরণ ক'রে চলতে, কথা বলতে, আত্মসংযম করতে এবং আরও অনেক কিছু করতে এবং না করতে শেখে। এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীর বহু শক্তি অযথা ব্যয়িত না হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়ে থাকে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সব কিছু শিক্ষা করতে হলে বহু শক্তি, দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো এবং সফলতা লাভ করা সব সময়ই সম্ভব হয়ে উঠতো না। সেক্ষেত্রে পরিবেশের সংগে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া স্বতন্ত্র প্রাণীমাত্রেরই পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত এবং ধরাপৃষ্ঠ হ'তে তারা এবং ধীরে ধীরে তাদের জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাই স্বভাবসুন্দরী প্রায় সকল প্রাণীর মধ্যেই অনুকরণ-স্পৃহাকে প্রকৃতিগত ক'রে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

প্রতিবদ্ধ শিক্ষা ঃ তৃতীয় শিক্ষাপ্রণালীর নাম প্রতিবদ্ধ শিক্ষা। রুশীয় বৈজ্ঞানিক পাভ্‌লভ্‌ (Pavlov) এই প্রণালীটি আবিষ্কার করেন এবং আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক ওয়াটসন মানবশিশুর শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই প্রণালীটির প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। খাদ্যবস্তু রসনার সংস্পর্শে এলে রসনা হতে লালা ক্ষরিত হয়। এই প্রতিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই চেষ্টা করে

এই আচরণটি শিক্ষা করতে হয় না। কিন্তু রুশিয়ার বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগারে লক্ষ্য করলেন যে, একটি কুকুরের মুখে খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা তার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যদি একটা ঘণ্টাধ্বনি করা যায় তাহলে বেশ কয়েক বার এই রকম করার পর ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরের জিহ্বা হতে লালা ক্ষরণ ঘটে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে লালা ক্ষরণের সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনির বিন্দু-বিসর্গ সম্বন্ধ নেই, কিন্তু উপরোক্ত উপায়ে বার বার যদি ঘণ্টাধ্বনি খাদ্য আস্বাদনের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তবে ঘণ্টাধ্বনিই প্রাণীটার ওপর খাদ্যবস্তুর মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ওয়াট্সন লক্ষ্য করেছেন উচ্চ শব্দের প্রতি শিশুদের একটা স্বাভাবিক ভীতি আছে। শিশু প্রথমে খরগোসকে ভয় করতে জানে না। কিন্তু শিশু খরগোসটাকে ধরতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি খুব জোর একটা শব্দ করা হয় তাহলে ক্রমে ক্রমে সে এই নিরীহ প্রাণীটাকে ভয় করতে শেখে। ওয়াট্সন মনে করেন আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার পশ্চাতে উক্ত প্রণালীর প্রভাব আছে। সুতরাং কোন একটি কাজ শিশুকে শেখাতে হলে কাজটিকে মজার করে তুলতে হবে। যে শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে শয্যা গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাকে যদি সেই সময় বিছানায় শুইয়ে একটি সুন্দর গল্প অথবা মিষ্টি গান শোনানো হয় তাহলে সে উৎসাহিত হয়ে প্রতিদিন গল্প এবং গানের লোভে যথাসময়ে শুতে যাবে। যে কোন অভ্যাস তৈরী ক'রতে হ'লে তার সঙ্গে আনন্দের আয়োজন করা এবং দুঃখ বা পীড়াজনক কোন রকম অভিজ্ঞতা যেন কাজটি সম্পাদন করার সময় ঘটতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। এই শিক্ষা প্রণালীটির সঙ্গে পরিণতি-সূত্রের অনেকটা মিল রয়েছে। গান শিশুকে আনন্দ দেয়। সঙ্গীতের সঙ্গে শয়নকে যদি সম্মিলিত করা হয় তাহলে শয়নে শিশুর আনন্দ হবে আর শয়নের পরিণতি আনন্দ একই কথা, শুধু বলার রীতিটা দু-ক্ষেত্রে দু-রকম।

অন্তর্দৃষ্টি ও শিক্ষা ঃ টেনেরিফ্ দ্বীপের গভীর অরণ্যপ্রদেশে

একটি পরীক্ষাগার নির্মাণ ক'রে কোলার (Kohler) শিম্পাঞ্জীদের শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা ক'রেছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য অনুরূপ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তিনি মনে করেন এই সব প্রাণীর বুদ্ধিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ এবং মানুষেরই মতো তারা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার সমাধান ক'রে থাকে। তাঁর বহু-বিচিত্র পরীক্ষার মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান পরীক্ষার উল্লেখ করা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত আবশ্যক মনে করেছি। প্রথম পরীক্ষা ঃ একটা বিরাট খাঁচা; শিম্পাঞ্জীর হাতের নাগালের অনেক উঁচুতে ছাদ। সেই ছাদের তলা থেকে কতকগুলো কলা ঝুলছে। খাঁচার ভেতর একটা টুল আছে। টুলটা এমন উঁচু যে শিম্পাঞ্জীটা তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে কলার নাগাল পাবে। প্রথমে দেখা গেল প্রাণীটা বেশ কয়েক-বার লাফালাফি ক'রে কলাগুলো পাড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে খাঁচাটার এককোণে চুপ ক'রে বসলো। চারিপাশে সম্যক দৃষ্টিপাত ক'রে কিছুক্ষণ পরে সে টুলটার কাছে উঠে গিয়ে সেটাকে ফলগুলোর ঠিক তলায় এনে রাখলো তারপর টুলের ওপর উঠে ফলগুলো পেড়ে নিয়ে খাঁচার একপাশে নিশ্চিন্ত-ভাবে আহার করতে সুরু করলে। দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ খাঁচার বাইরে অনেক দূরে এক গুচ্ছ ফল পড়ে আছে। খাঁচার ভেতর দুটো লাঠি পড়ে আছে, কিন্তু সেগুলো এমন ছোটো যে কোন একটা লাঠি ধরে শিম্পাঞ্জীটা যদি তার গোটা হাতটা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে বাইরে বাড়িয়ে দেয় তাহলেও তার পক্ষে ফলের নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সে যদি দুটো লাঠি এক সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে বাইরে হাত বাড়ায় তাহলে অনায়াসেই ফলের গুচ্ছটাকে টেনে খাঁচার কাছে আনতে পারবে। এই উদ্দেশ্যেই দুটো লাঠি খাঁচার ভেতর রাখা হয়েছিলো এবং একটা লাঠির ভেতরটা ছিল ফাঁপা। পরীক্ষার সময় দেখা গেলো শিম্পাঞ্জীটা প্রথমে একটা একটা লাঠি নিয়ে তাই দিয়ে ফলগুলোকে খাঁচার কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করলো। অনেক চেষ্টা

করেও সে যখন সফল হতে পারলে না তখন একধারে বসে পড়ে লাঠিগুলোকে নাড়াচাড়া ক'রে দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ একটা লাঠিকে আর একটা লাঠির ভেতর ভরে একটা খুব বড়ো লাঠি তৈরী করলে এবং তাই দিয়ে ফলগুলোকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে টেনে এনে মনের আনন্দে খেতে লাগলো। তৃতীয় পরীক্ষা ঃ খাঁচার বাইরে ফল অথচ নাগালের বাইরে। খাঁচার ভেতরে কোন লাঠি নেই, শুধু খাঁচার মধ্যে আর একটা স্বতন্ত্র কুঠরীতে শিম্পাঞ্জীর শয্যা-সামগ্রী রয়েছে। এই পরীক্ষা যখন করা হয় তার পূর্বে অবশ্যই প্রাণীটা লাঠি ব্যবহার ক'রতে শিখেছিলো। এই পরীক্ষার সময় দেখা গেলো শিম্পাঞ্জীটা প্রথমে অনেক অযথা পরিশ্রম করলো ফলের নাগাল পাবার জন্য। অবশেষে শুধু হাতে নাগাল না পেয়ে সে তার শয়নকক্ষ হতে কম্বলটা নিয়ে এলো এবং তার সাহায্যে ফলগুলোকে খাঁচার পাশে টেনে আনলো। কোলার এইরূপ আরও অনেক পরীক্ষা ক'রে সিদ্ধান্ত করলেন প্রাণীগুলি তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যদিও প্রথম প্রথম নির্বোধের মতো আচরণ করছিলো, কিন্তু তাসত্ত্বেও সমস্যার সমাধান তারা করেছিলো বুদ্ধি দিয়ে। অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় তারা পরিস্থিতিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলো। প্রথম প্রথম টুলের সঙ্গে ফলের, একটা লাঠির সঙ্গে আর একটা লাঠির এবং তাদের সঙ্গে ফলের এবং লাঠির সঙ্গে কম্বলের সঙ্গে ফলের কী সম্বন্ধ তা প্রাণীগুলি বুঝতে পারেনি। তাই তারা সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রচুর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু অকস্মাৎ অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাবে তাদের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, পরিস্থিতিটার রূপই গেছে বদলে। যে লাঠিটা অর্থহীন ছিলো তাই হয়ে উঠেছে অর্থময়, যে টুলটা ছিলো অনাবশ্যক তাই অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। আপত্তি উঠতে পারে প্রাণীগুলি যদি বুদ্ধিমানই হবে তবে গোড়াতেই তারা যন্ত্রপাতিগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না কেন? কিন্তু এই প্রশ্ন অবান্তর। মানুষ যে বুদ্ধিমান

প্রাণী তাতে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন একটি পরিস্থিতিতে পড়লে এই অতি বুদ্ধিমান প্রাণীটিও নির্বোধের মতো আচরণ করতে বাধ্য হয়, অন্য প্রাণীর কথা তো দূরের কথা। তাছাড়া আমাদের নিজের নিজের মন বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবো অন্তর্দৃষ্টি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয় না, তার আবির্ভাব ঘটে অকস্মাৎ। বিজ্ঞানাচার্য আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বুদ্ধিকে সন্দেহ করা চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক, কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার উদ্ভাস ঘটেছিলো অকস্মাৎভাবে। তথ্য আবিষ্কার করার আগে অনেকবার আর্কিমিডিস্ চৌবাচ্চায় স্নান করেছিলেন, গ্যালিলিও অনেক সামগ্রীকে দুলতে দেখেছিলেন, নিউটন অনেক কিছুকে শূন্য হতে মাটিতে পড়তে দেখেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁদের কাছে এইসব ব্যাপার অর্থহীন ছিলো, অনেক পরে অতি অকস্মাৎ তারা অর্থময় ও অমূল্য হয়ে উঠেছে মাত্র। সুতরাং কোলার যদি বলেন শিম্পাঞ্জীগুলির শিক্ষার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে তাহলে তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলুম। যদিও একদল পণ্ডিত নিজের আবিষ্কৃত প্রণালীটিকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অপরাপর প্রণালীগুলির প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন তথাপি যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন এইসব সমালোচনা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। নিজের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করার লোভে একজন আর একজনের মতবাদকে বিকৃত করেছেন এবং আপন মতবাদের প্রতিকূল ঘটনাবলীকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। এইসব বাদানুবাদের জটিলতায় প্রবেশ করার দরকার আমাদের নাই। আমরা শুধু একথাই বলতে চাই যে, সকল রকম শিক্ষাকে যে কোন একটা প্রণালী দিয়ে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, সুতরাং কোন একটি প্রণালীই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অবশ্যই যে প্রাণী যতো বুদ্ধিমান তার শিক্ষায় বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ততো

বেশী মেলে, কিন্তু তাই বলে অন্য প্রণালীগুলি তার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য একথা কিছুতেই বলা চলে না। সুতরাং এই চারটি প্রধান শিক্ষা প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুকে কোন কিছু শিক্ষা দেবার আগে লক্ষ্য করতে হবে তার দেহমন এই বিশেষ কাজটি সম্পাদন করবার উপযোগী কী না সেদিকে। মলাশয় ও মূত্রাশয়কে যে সব স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত করে, সেগুলির যথারীতি পুষ্টি সাধনের আগেই যদি শিশুকে মলমূত্র নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে এই শিক্ষা লাভ করতে সে সফল হবে না এবং নতুন কিছু আয়ত্ত করার আগ্রহ তার কমে যাবে। তেমনি দু তিন বছরের শিশুকে যদি অনেকক্ষণ এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সে কখনই কৃতকার্য হবে না; তার কারণ তার দেহের মধ্যে অহরহ যে সব পরিবর্তন ঘটছে সেগুলি স্বভাবতঃই তাকে চঞ্চল করে রাখে, চুপ করে বসতে দেয় না। আবার যে শিশুর অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার মতো দেহ এবং মনের বিকাশ ঘটেছে তাকে যদি ঘরের বাইরে যেতে না দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রকৃতিকে পীড়ন করা হবে এবং তার শরীর অসুস্থ হয়ে প'ড়বে।

যে কোন কাজ ঠিকমত শিক্ষা ক'রতে হ'লে বার বার সেটি সম্পাদন ক'রতে হবে। কিন্তু কাজটি যদি আনন্দদায়ক না হ'য়ে পীড়াদায়ক হয় তাহলে শিশু পুনরায় সেটি সম্পাদন ক'রতে চাইবে না। সুতরাং কোন একটি কাজ শিশুকে শেখাতে হলে কাজটিকে মজার ক'রে তুলতে হবে। যে শিশুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শয্যা গ্রহণ করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাকে যদি সেই সময় বিছানায় শুইয়ে একটি সুন্দর গল্প অথবা মিষ্টি গান শোনানো হয় তাহলে সে উৎসাহিত হয়ে প্রতিদিন গল্প এবং গানের লোভে যথাসময়ে শুতে যাবে। ধীরে ধীরে গল্প এবং গানের মাত্রা কমিয়ে আনলে তার মধ্যে গল্প ও গানের প্রতি লোভটা প্রবল হতে পারবে না অথচ ঠিক সময়ে শয্যা গ্রহণ ও নিদ্রার অভ্যাসটি সুদৃঢ় হ'য়ে যাবে। নিজের

হাতে খাবার খেতে যখন শেখানো হবে, তখন যদি শিশুকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয় অর্থাৎ সে যদি হাত দিয়ে চামচ, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করবার সুযোগ পায় তাহলে নিজের কৃতিত্বে আনন্দিত হ'য়ে উঠবে। তার স্বাধীনভাবে চলার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং অতি সহজেই কাজটা শিখে ফেলবে সে। যে কোন অভ্যাস তৈরী ক'রতে হ'লে তার সঙ্গে আনন্দের আয়োজন করা এবং দুঃখ বা পীড়াদায়ক কোন রকম অভিজ্ঞতা যেন কাজটি সম্পাদন করার সময় ঘটতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। কিন্তু কোন একটি বিশেষ কাজ বার বার করার জন্য শিশুকে যদি খুব বেশী পীড়াপীড়ি করা হয় এবং তার কাজের নির্মম সমালোচনা করা হয় যেমন, "তুমি কি গ্লাসটা এইভাবে ধরতে পারো না, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছুই হবে না দেখছি ইত্যাদি", তাহলে কাজটির উপর শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মাবে। তার সকল আগ্রহ উবে যাবে। অতএব এই সব খুঁটিনাটি বিষয়ে অতিশয় সতর্কতার আবশ্যক। শিশুর পক্ষে কাজটি যাতে সহজসাধ্য হয় সেদিকেও খুব বেশী দৃষ্টি দিতে হবে। যে শিশুটিকে নিজে নিজে জামা কাপড় পরার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার জামা কাপড়গুলো যদি খুব হাল্কা হয় এবং সেগুলো পরিধান করা যদি তার পক্ষে সহজ হয় তাহলে অনায়াসেই একাজটা সে করতে পারবে।

আদেশ অপেক্ষা উপরোধ ও উপদেশ শিশুকে ভালো কিছু শিখবার জন্য অধিক সাহায্য করে। ভয় দেখিয়ে বা শাস্তি দিয়ে শিশুকে কিছু শেখানো যায় না। তার ভুলের জন্য তাকে তিরস্কার না ক'রে তার ভাল করার জন্য তাকে প্রশংসা করায় বেশী কাজ হয়। অর্থাৎ তার দোষটাকে বড়ো ক'রে না দেখে তার গুণটাকে বড়ো ক'রে দেখলে ফল ভালো হয়।

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সুষ্ঠু বিকাশ। শিশুর মধ্যে যে সব প্রেরণা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সেগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার, বিকশিত করে তোলার নামই শিক্ষা। শিশুর সুপ্রবৃত্তিগুলিকে

সম্যকরূপে জাগ্রত করা এবং তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে সুপথে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই মহান উদ্দেশ্যটি সফল করে তোলার কাজটি কিন্তু সহজ নয়। এ কাজটি করতে হলে প্রতিটি একক শিশুর প্রবৃত্তি ও প্রেরণাগুলিকে যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালন করার প্রয়োজন আছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নার্সারীতে গিয়ে দেখেছি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ এখানে যত্ন ও সতর্কতাসহকারে প্রতিটি শিশুর কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ লক্ষ্য করে থাকেন। যে শিশুর মধ্যে যে রকম স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, অনুকূল পরিবেশ রচনা করে সেইসব প্রেরণাকে বিকশিত করে তুলতে চেষ্টা করেন। যার মধ্যে ছবি আঁকার ক্ষমতা আছে তাকে নানাভাবে ছবি আঁকার সুযোগ ও সুবিধা দান করেন। যার খেলার ঘরবাড়ী তৈরী করার সখ আছে, তাকে নানাবিধ সরঞ্জাম দিয়ে ঘর তৈরী করতে উৎসাহিত করেন। যে শিশুটি রীতিমত অসামাজিক ও নিঃসঙ্গ তাকে সামাজিক করে তোলার উদ্দেশ্যে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশবার জন্য নানা উপায়ে তাকে প্রলুব্ধ করেন। ইতিহাসে যার আগ্রহ নাই, তাকে সরস গল্পচ্ছলে ইতিহাসের কাহিনী পরিবেশন করে ধীরে ধীরে তার অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের প্রতি তাকে অনুরক্ত করে তোলেন। মোটের উপর শিশুর প্রেরণা ও প্রবৃত্তি-গুলিকে তাঁরা ইচ্ছামত রূপদান করেন। তাঁদের এই মহান কাজে সহায়তা করেন শিশুর জনক-জননী। একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে বিশেষ একটি শিশুকে যথাযথভাবে লক্ষ্য করা যেমন কঠিন, শিশুর মাতাপিতার পক্ষে শিশুটিকে লক্ষ্য করা তেমন কঠিন নয়। তার কারণ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে একাধিক শিশুর উপর দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া তাঁরা কোন একটি বিশেষ শিশুকে সব সময়ই নিজেদের কাছে পান না এবং মাতাপিতার সান্নিধ্য থেকে শিশুকে বেশীক্ষণ বিচ্ছিন্ন করে রাখাটাও সমীচীন নয়। তাই শিশুটির সম্বন্ধে তাঁরা যা জানতে পারেন না, শিশুটির মাতাপিতা তাঁদের সেই সব কথা জানতে চেষ্টা করেন। এজন্য মাতাপিতারও

উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। যুক্তরাজ্যে যে সব 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকস্ বা চাইল্ড গাইডেন্স সেণ্টার্স' আছে যুক্তরাজ্যের মাতা-পিতাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিশু পর্যবেক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে। আপন আপন শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেই কিন্তু মাতাপিতার দায়িত্ব সম্পন্ন হয় না। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও মনস্তাত্ত্বিকের পরামর্শমতো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হয়, অনেক কু-অভ্যাস পরিবর্জন করতে হয় এবং গৃহে শিশুর সুস্থ বিকাশের পক্ষে অনুকূল একটি পরিবেশ রচনা করতে হয়। এদেশের অধিকাংশ মাতাপিতাই শিশুর মঙ্গলের জন্য সাগ্রহে এই সব কাজ করে থাকেন। তাঁদের এই কাজে এখানকার সরকার এবং জনপ্রতিষ্ঠান নানাভাবে সাহায্য করেন। শিক্ষালয়ে খেলাধূলার নানাবিধ সরঞ্জাম থাকে। কোন কোন স্কুলে খেলা করার জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বা বাগান আছে। নানারকম জন্তু-জানোয়ারের ছোট ছোট চিড়িয়াখানা আছে। শিক্ষা দানের রীতিটা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। সরকার এবং জনপ্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষার অন্তে অনেক শিশুকে জলপানি দিয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভে সাহায্য করেন। শিশু-শিক্ষণ বা সংশোধন কেন্দ্রে শিশুদের পরীক্ষা ও পরিচালনা করার সুবিধা আছে। প্রাথমিক শিক্ষার পর দক্ষতা, আগ্রহ, দৈহিক স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন মূল্যবান বিষয় বিবেচনা করে যাকে যে শিক্ষার উপযোগী মনে করা হয়, তাকে সেই মত শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। সরকারী কেন্দ্রে, জনপ্রতিষ্ঠানে, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে, বিদ্যালয় এবং কলেজে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের কী কী বিষয়ে বা কাজে পারদর্শিতা লাভ করার সম্ভাবনা আছে, সেটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিরূপিত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য নার্সারী স্কুলের বা প্রাথমিক স্কুলের রিপোর্ট এবং মাতাপিতার কাছ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন খবরাখবরের উপর যথেষ্ট মূল্য আরোপ করা হয়। শিশুর আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুসারে সুযোগ যেমন তাকে

দেওয়া হয়, তেমনি ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে শৃঙ্খলাপ্রীতি, উদ্ভাবনীশক্তি, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, চিন্তাশীলতা, সামাজিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উন্মেষ করারও চেষ্টা চলতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে শৃঙ্খলার রাজ্য বলা যেতে পারে। এখানে পরস্পরে দেখা হলেই 'সুপ্রভাত'. 'শুভ-মধ্যাহ্ন' কিংবা 'সুসন্ধ্যা' জানাতে হয়। কাজের সময় মন দিয়ে কাজ করতে হয়। অবসর সময়ে কাজের কথা ভুলে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। অপরের কাজে বাধা দেবার রীতি নাই। ঝগড়া করতে নাই। বিদ্রূপ করা নীতিবিরুদ্ধ। এখানে পদে পদে নিয়ম, পদে পদে শৃঙ্খলা। শৈশব থেকেই এদেশের ছেলেমেয়েরা এই রকম শৃঙ্খলা শিক্ষালাভ করে। তাই যখন তারা বড়ো হয় তখন শৃঙ্খলা-প্রীতি তাদের আপন প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে যায়। এখানে পদে পদে শৃঙ্খলা, কিন্তু শৃঙ্খলা এদের পদে পদে শৃঙ্খল হয়ে বাজে না। এখানে কেউ কারো কাজে বাধা দেয় না, তাই সকলেরই গতিবিধি এখানে সহজ ও সাবলীল। শঙ্কা নাই, সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই। এদেশের স্কুল ও কলেজের শিক্ষাদানের ধারাটা আমাদের দেশের থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে অর্থপুস্তকেরই উপর বেশী নির্ভর করে। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী আশা করে শিক্ষক তাদের জ্ঞাতব্য যা কিছু আছে সবই বলবেন। অর্থাৎ শিক্ষক ক্লাশে যা বলবেন তার অতিরিক্ত কিছুই যেন জানার নাই, অথবা থাকলেও সেটা জানা নিষ্প্রয়োজন। এদেশে ঠিক উল্টো। এখানকার শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেন যে, পড়া-শুনাটা তাদের নিজেরই কাজ। যে জায়গাটা তারা বুঝতে পারবে না, শুধু সেই জায়গায় বুঝতে সাহায্য করাই তাঁর কাজ। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে এখানে পাঠ্যপুস্তক বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পুস্তক রীতিমত মন দিয়ে পড়তে হয়। তা না হলে গুরুমশাই এমন সব প্রশ্ন করেন যে, তার উত্তর দেওয়া সহজ নয় এবং উত্তর দিতে না পারলে ফাঁকি ধরা পড়ে গিয়ে ছাত্রকে ভীষণ লজ্জায় পড়তে

হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে অর্থাভাববশতঃ পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারে না। প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পাওয়া যায় এমন পাঠাগারও আমাদের দেশে কম। যে দু-চারটে পাঠাগার আছে সেগুলো লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে। বই বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না এবং বসে পড়ারও যথারীতি ব্যবস্থা নাই। এখানে প্রচুর পাঠাগার আছে এবং প্রত্যেকটিই চমৎকার। একজন ছাত্র অনায়াসে অনেকগুলি পাঠাগারের সদস্য হতে পারে। চাইলেই বই পায়। পাঠাগার-গুলিতে বসে পড়ার ব্যবস্থা মনোরম। পাঠাগারগুলি এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিবর্জনীয় অঙ্গবিশেষ। উপযুক্ত শৃঙ্খলা-বোধ ও নীতিশিক্ষার গুণে বাজে নাম ঠিকানা দিয়ে (তার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও) বই চুরি করে নেয় না। যথাসময়ে বই ফেরৎ দেয়। বইটি যখন কারো কাছে থাকে, তখন সে তার পুরোপুরি যত্ন করে। দরকারী পাতা বা ছবি ছিঁড়ে রাখে না। পাঠাগারে কেউ কোনরকম সাড়াশব্দ করে অন্যের বা নিজের পড়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। নিজের স্বার্থের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখে, তেমনি দৃষ্টি রাখে অন্যের স্বার্থের দিকে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্র সকলেই মিলিত হয়ে মাঝে মাঝে এক একটা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করে। এর ফলে চিন্তাধারা পরিষ্কার ও সহজ হয় এবং নতুন নতুন পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হবার সুযোগ লাভ করে। এমনি করে ছেলেমেয়েরা চিন্তাশীল ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এদেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের দেশের ছাত্রদের যখন তুলনা করি, তখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আমি আদৌ দোষ দিই না, দোষ দিই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে, আমাদের সমাজব্যবস্থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারে না। অর্থের জন্য হয় তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় কিংবা অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। এর ফলে তাদের

আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ হয়ে তারা অস্বাভাবিক, পরনির্ভরশীল এবং বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কেউ কেউ নির্জীব হয়ে পড়ে, কেউ বা দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে ওঠে। সময়াভাবে অনেকে যথারীতি লেখাপড়া করতে পারে না। ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল দেখে অনেকে লেখাপড়ায় উৎসাহ পায় না। অনেক সময় মাতাপিতার ইচ্ছায় অথবা ভবিষ্যতে ভালো চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে ভেবে এমন বিষয় পড়তে বাধ্য হয়, যাতে নাকি তাদের আন্তরিক আগ্রহ নাই, অথবা যোগ্যতা নাই। তার ফলে তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না, অনেক অবাঞ্ছিত পথে তাদের কৌতূহল ধাবিত হয়, ক্লাশে তারা নানারকম গোলমালের সৃষ্টি করে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। পড়ানোর রীতিটাও আমাদের দেশে ছাত্রছাত্রীর সুষ্ঠু বিকাশের প্রতিকূল। পরীক্ষায় এমন সব প্রশ্ন করা হয়, যার উত্তর অর্থ-পুস্তক পড়েই দেওয়া সম্ভব। সুতরাং তারা পাঠ্যপুস্তক পড়ার উৎসাহ পায় না। অনেক সময় শিক্ষকও অর্থপুস্তকের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাদান করেন। তার কারণ তাঁকে একই দিনে অনেকগুলি বিষয় পড়াতে হয়, অনেক বেশী ক্লাশ নিতে হয়, অর্থপুস্তকাতিরিক্ত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখেন, তাতে ছাত্রদের আগ্রহ নাই বা সে সব বিষয় অনুধাবন করার ক্ষমতা নাই তাদের। সুতরাং তিনি সে চেষ্টা অবিলম্বে ত্যাগ করেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাবে তিনিও মন দিয়ে কাজ করার উৎসাহ পান না। তাছাড়া তাঁর শুভ প্রচেষ্টা ছাত্রদের কাছে যেমন অনুকূল সাড়া পায় না, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছেও অনাদৃত কিংবা লাঞ্ছিত হ'য়ে থাকে।

একদিনেই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো বিদূরিত করা সম্ভবপর নয়। সেটা করতে হবে ধীরে ধীরে এবং পাঠশালা থেকে সুরু ক'রে। পাঠশালা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংশোধন না ক'রে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তা এবং আত্ম-নির্ভরতা শিক্ষা দিয়েই যদি কলেজের প্রশ্নাবলী এমন করা যায়,

যার উত্তর কেবলমাত্র অর্থপুস্তক পড়ে কিংবা অধ্যাপকের বক্তৃতার উপর নির্ভর ক'রে দেওয়া অসম্ভব, তা'হলে ছাত্রছাত্রীরা যে ধর্মঘট করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু কারণ নাই। ছাত্রদের সুস্থ ও বলিষ্ঠ করতে হলে পাঠশালা থেকেই শিক্ষাসংস্কার সুরু করতে হবে অর্থাৎ শিশুদের শিক্ষার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শৈশব-শিক্ষা ভ্রান্তিমূলক হলে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিটাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। আমাদের দেশ ও যুক্ত-রাজ্যের শিক্ষা বিষয়ে তুলনা করতে গিয়ে যা বললুম তা থেকে যেন এ রকম মনে করা না হয় যে, যুক্তরাজ্যের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভালো এবং আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতিটা সম্পূর্ণ মন্দ। উভয় শিক্ষাপদ্ধতিরই দোষগুণ আছে। তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ওদের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে উন্নততর এবং বেশী বিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে ওদের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

শৈশব-দর্শন

সাধারণত আমরা বিশ্বাস করি শিশুর কোন রকম দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে না। আমাদের কাছে 'দর্শনের' অর্থ বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিভিন্ন চিন্তাধারার সুসম্বদ্ধ সমন্বয়। শিশুদের অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম তাই তাদের যে কোন দর্শন আছে, এ কথাটা আমরা সহজে মানি না। কিন্তু শিশুরা প্রায়শঃই কথায় বার্তায় বিবিধ প্রাকৃতিক ঘটনা, বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি ও মনের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যে সব অভিমত প্রকাশ করে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিশুদের একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তাদের চিন্তাধারা একটা বিশিষ্ট পন্থা অনুসরণ ক'রে প্রবাহিত হয়। এইটাই শৈশব-দর্শন।

প্রথমতঃ দেখা যায় শিশু কল্পিত ও বাস্তবের মধ্যে যে ব্যবধান সেটা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত মন্থরগতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথমে সে অপরাপর ব্যক্তি অথবা বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা ক'রে ভাবতে পারে না। তাই তার আপন মনের অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনা তার কাছে বহির্জগতের সামগ্রী বলে মনে হয়। ছোটো ছোটো শিশুরা মনে করে চিন্তা এক প্রকার স্থূল দৈহিক ক্রিয়া মাত্র। চিন্তা আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন বিভেদ তারা বুঝতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে আমরা চিন্তা করি। সাত থেকে দশ বছর বয়সের শিশুরা অনেক বয়স্ক ব্যক্তির মতোই মনে করে মাথার সাহায্যে আমরা চিন্তা করি। কিন্তু এদের বিশ্বাস মাথার মধ্যে সূক্ষ্ম স্বরের সাহায্যে চিন্তা সম্পাদিত হয়। কেউ কেউ বলে চিন্তাকে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, কিন্তু যখন সে মুখের ভেতর থেকে বাইরে আসে তখন আঙুল দিয়ে তাকে অনুভব করা

যায়। শিশুর মতে চিন্তার আবাসভূমি দেহের অভ্যন্তরে হলেও বহির্জগতের বস্তু হতে চিন্তাকে তারা পৃথক ক'রে ভাবতে পারে না। অনেক শিশুর ধারণা যে, বাতাস গাছে পাতায় মর্মর জায়গায় আমাদের চিন্তারাশি সেই বাতাস দিয়েই নির্মিত। স্বপ্ন সম্বন্ধেও শিশুদের ধারণা অতি বিচিত্র। কেউ মনে করে রাত্তির বেলায় স্বপ্নের দল বাহির থেকে এসে তার বিছানার চারিপাশে পতপত্ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। কারো ধারণা স্বপ্নগুলি ছোটো ছোটো ছবি অথবা ঝলমলে আলো। চাঁদ মামা, মেঘ, সুর্জি, বাতাস অথবা রাস্তার পাশে যে সব আলোক স্তম্ভ আছে তারাই রাত্তির হলে স্বপ্নদের চারিদিকে পাঠিয়ে দেয়। কোন একটা বিশেষ ঘরে অনেক সময় শিশুরা শুতে চায় না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে— এ ঘরে স্বপ্ন থাকে। একটু বড় হলে তারা মনে করে স্বপ্ন বাইরে নয় তাদের নিজেদের মাথার ভিতরেই অবস্থান করে এবং তারা ঘুমিয়ে পড়লে বাইরে বেরিয়ে আসে আবার জেগে উঠলে মাথার ভেতর প্রবেশ করে। দশ এগারো বছর বয়স হলে শিশুরা স্বপ্নের অলীকতা বুঝতে শেখে। কোন বস্তু বা বিষয়ের নাম সম্বন্ধেও ছোটদের ধারণা অত্যন্ত অদ্ভুত। তারা মনে করে নামটা বস্তু বা বিষয়ের একটা অন্তর্নিহিত বিশিষ্টতা। সূর্যকে যেমন উজ্জ্বল গোলাকার একটা বস্তু ছাড়া আর কোন রকমেই ভাবা যায় না, সেইরূপ তাকে 'সুর্জি' ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না। নামটা বস্তুর একটা অপরিহার্য গুণ বিশেষ এবং নাম ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শিশুদের ধারণা বস্তুটি নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা নামকরণ হ'য়ে গেছে এবং সে নামের অদল-বদল অসম্ভব। আর একটা বিষয়েও শিশুদের চিন্তাধারা বেশ একটু অভিনব। সেটা হ'ল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা প্রভৃতির গতিবিধি। শিশুরা যখন পথ দিয়ে চলে তখন এই সব নৈসর্গিক বস্তুগুলিও তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে সুরু করে। অল্পবয়স্ক শিশুরা মনে করে তারাই তাদের যাদু-শক্তির বলে এই সমস্ত

বস্তুকে গতিশীল ক'রে দেয়। নিজেদের এই আশ্চর্য শক্তির অধিকারী ভেবে শিশুরা আনন্দে ও গর্বে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে! কিন্তু তারা যখন একটু বড় হয়, তখন উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। তারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে ওঠে এবং নৈসর্গিক বস্তুগুলিকে জীবন্ত ও গতিশীল বলে ভাবতে শেখে। তাই তারা ভাবে সূর্য চন্দ্র যখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তখন আপন খেয়ালেই চলে, তাদের আদেশে চলে না। জীবন ও চেতনা সম্বন্ধে শিশুর ধারণা শৈশব-দর্শনের দ্বিতীয় কথা।

প্রথম প্রথম যে বস্তুর কার্যশক্তি ও প্রয়োজনীয়তা আছে শিশু তাকেই প্রাণবন্ত ও চেতন বলে মনে করে। সূর্য আলোক দান করে, মেঘ বর্ষণ করে, বাতাস চলাচল ক'রে আরাম দেয়, নদী বুকে ক'রে ডিঙি বয়ে নিয়ে যায়। প্রায় সব কিছুই কাজ করে এবং মানুষের কোন না কোন কাজে লাগে। তাই শিশুর মনে হয় বিশ্ব জগতে সব কিছুরই প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। ছ' সাত বছর বয়স হলে জীবন সম্বন্ধে শিশুর ধারণা একটু বদলে যায়। সব কিছুকে সে আর জীবন্ত মনে করে না। শুধু যে সব বস্তুর নড়াচড়া করার ক্ষমতা আছে শিশুর মতে শুধু তারাই প্রাণ ও চেতনার অধিকারী। সূর্য, চন্দ্র আকাশের ওপর ঘুরে বেড়ায়, বাতাস চারিপাশে দাপাদাপি করে, গাছের ঝরা পাতা, আকাশের হালকা মেঘ দিকে দিকে অভিযান করে। তাই তারা সজীব ও সচেতন। কিন্তু ঘর-বাড়ি, মাঠ, পাহাড় যাদের চলাচলের ক্ষমতা নেই, শিশুর দর্শনে তারা নির্জীব নিশ্চেতন। আট দশ বছর বয়স হলে শিশু জীবনের গন্ডীকে আরও একটু সংকীর্ণ করে ভাবতে শেখে। গতিশীল বস্তুমাত্রকেই সে প্রাণবন্ত মনে করে না। শুধু যে বস্তুর নিজের গতি আছে, তাকেই শিশু সজীব মনে করে। তাই বাতাস সজীব, কিন্তু মেঘ নির্জীব; কারণ মেঘ নিজে চলে না, বাতাস তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এই কারণে নদী জীবন্ত কিন্তু ডিঙি জড়। নদী নিজে চলে, ডিঙি চলে জলের টানে। প্রায় এগারো বছর যখন

তার বয়স, তখন শিশু কেবলমাত্র জীবজন্তু ও গাছপালাকে, এমন কি শুধু জীবজন্তুকেই প্রাণ ও চৈতন্যের অধিকারী বলে মনে করে, বাকী যা কিছু সবই জড় জগতের অধিবাসী হয়ে পড়ে। বিশ্ব-জগত জীব এবং জড় এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধেও শিশুদের ধারণা বেশ কৌতুকপ্রদ। সাত আট বছরের শিশু প্রকৃতিকে মানুষের সৃষ্টি বলে মনে করে। তার বিশ্বাস কোন এক সময়ে কোন একজন মানুষ একটা জ্বলন্ত গোলক তৈরী ক'রে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেই গোলকটাই সূর্য। মাটি কেটে মানুষ খাল তৈরী করেছে। তারপর তার ভেতর জল ঢেলে নদী, পুকুর, ঝিল, বিলের সৃষ্টি করেছে। মাটির পর মাটি চাপিয়ে পাহাড় পর্বত তৈরী করেছে। মাটিকে জমাট ক'রে পাথর গড়েছে। পাথর ভেঙে মাটি করেছে ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শিশুর এই ধারণা সত্ত্বেও প্রকৃতিকে জীবন্ত মনে করা শিশুর পক্ষে কষ্টকর হয় না। মানুষ যে সূর্য সৃষ্টি করেছে সেই সূর্যই শিশুকে অনুসরণ করে। মানুষের গড়া পাহাড় দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। দোকানী বীজ তৈরী ক'রে পাতা এবং ফুলের জন্য তার ভেতর লাল, নীল, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি বিবিধ রঙ ভরে দেয়, কিন্তু সেই বীজ থেকে নিজে নিজেই অঙ্কুরোদ্গম হয়, পাতা গজায়, ফুল ফোটে, ফল ধরে। শিশুর এই সব ধারণার পশ্চাতে দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অল্পবয়স্ক শিশু অতিশয় আত্মকেন্দ্রিক। তার বিশ্বাস যা কিছু আছে সব তারই সুখের জন্য। এই মনোভাব থেকেই সে ভেবে নেয় বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত মাতাপিতার শক্তির ওপর শিশুর অগাধ বিশ্বাস। মাতা-পিতাকে সে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বলে মনে করে। তার চিন্তার এই বিশিষ্টতাই মানুষকে প্রকৃতির স্রষ্টা বলে ভাবতে শেখায়। শিশু ক্রমে ক্রমে যত বড় হতে থাকে, কার্য-কারণ সম্বন্ধে তার ধারণা ততই বাস্তব হয়ে ওঠে।

বিশ্বজগতের সব কিছুই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে।

শিশু যা-কিছুর সংস্পর্শে আসে, তাকে বুঝবার চেষ্টা করে এবং তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটা দর্শন রচনা করে। সব কিছু বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে শিশুর ধারণা আলোচনা করা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নয় ব'লে কয়েকটি মাত্র প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করেছি। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সাহায্যে যে কোন চিন্তাশীল ও আগ্রহবান ব্যক্তিই শিশুর দর্শন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন। শুধু তাঁদের শিশু-মন সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'তে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে সংস্কারমুক্ত করতে হবে।

মাতাপিতা ও শিশু

'শিশু-মনের' গোড়াতেই এমন কতকগুলি শিশুর উল্লেখ করেছি, যাদের নিয়ে মাতাপিতাকে প্রচুর বেগ পেতে হয়। তাঁরা বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত, জ্বালাতন হয়ে ওঠেন। বিরক্ত হন তাদের ওপর। সন্তানের ব্যবহারে অন্যের কাছে তাঁদের লজ্জিত হতে হয়। কখন কী অঘটন ঘটে সেজন্য দিবারাত্র তাঁদের সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। এই সব শিশু পিতামাতার কাছে এক একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের বলা হয় "সমস্যা-শিশু"। বিচিত্র ধরনের 'সমস্যা-শিশুর' সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অকালপক্কতা, অতিরিক্ত চঞ্চলতা অথবা গভীর আলস্য, স্বপ্নবিলাস, খিটখিটে মেজাজ, অকারণ ভীতি, ঋণাত্মক মনোভাব, কলহপ্রীতি, ভীষণ জেদ, অভব্য ও অশিষ্ট আচরণ, মিথ্যাভাষণ, পরস্ব অপহরণ, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা নিজেকে জাহির করার অদম্য প্রয়াস, শংকা ও সঙ্কোচ, পাঠশালা পলায়ন, নিশিচারণ ইত্যাদি বহু বিচিত্র শিশু-সমস্যার কতিপয় উদাহরণ মাত্র। মাতাপিতা এই সব শিশু-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কামনা করেন। বর্তমান প্রবন্ধে সমস্যা-শিশুকে সংশোধন ক'রে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, তারই আলোচনা করছি।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই গুরু কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের দেখতে হবে বিবিধ শিশু-সমস্যার পশ্চাতে কী কারণ আছে। ডালপালা বিস্তার ক'রে যে সমস্যাটি আমাদের চক্ষের সম্মুখে আজ অতি জটিল রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তার বীজটির সন্ধান করাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। যে সব মনোবিজ্ঞানী বিচিত্র শিশু-সমস্যার উৎস সন্ধানে অভিযান করেছেন তাঁরা সকলেই লক্ষ্য করেছেন শিশুর প্রতি মাতাপিতার অদ্ভুত আচরণ ও মনোভাবই শিশুকে "সমস্যা-শিশু" করে তোলার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কোন

শিশুই "সমস্যা-শিশু" হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তার পরিবেশই তাকে সমস্যামূলক ক'রে তোলে একথাটা অত্যন্ত সত্য কথা। মাতাপিতাই শিশুর প্রথম জীবনের পরিবেশ এবং তাঁরাই কীভাবে সহজ সরল শিশুটিকে জটিল করে, বাঁকা করে গড়ে তোলেন সে কথা বলছি।

অনেক মাতাপিতা শিশুর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন, শিশুর বিরুদ্ধে যেন একটা অন্ধ আক্রোশ তাঁদের অন্তরের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারেই শিশু-পালন বিষয়ে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সহযোগিতা নাই। পুরুষেরা মনে করেন শিশুদের মানুষ করা একমাত্র মেয়েদেরই কাজ। কিন্তু মেয়েরা ঘরকরনার কাজ ক'রে ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো সামলে উঠতে পারেন না। জ্বালাতন হয়ে ওঠেন। যে সময়টা তাঁরা ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যয় করেন সেই সময়টা আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত হতে পারতো। তাই শিশুর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ, একটা আক্রোশ তাঁদের মনের গহনে সঞ্চিত হয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক সময় শিশুকে মাতা অথবা পিতা আপন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেন। শিশু যদি পিতার অতিরিক্ত স্নেহভাজন হয় তাহলে মাতার অন্তরে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয়। পক্ষান্তরে স্বামী যদি লক্ষ্য করেন স্ত্রী সর্বদাই সন্তানের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন, তাহলে শিশুর প্রতি তাঁর মনে একটা দ্বেষ-কলুষিত বৈরীভাবের উদ্রেক হয়। এক ধরনের মা আছেন যাঁরা অলস প্রকৃতির মানুষ, পরনির্ভরশীল। তাঁদের সংসারের কাজকর্ম করতে হয়, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও করতে হয়। তাঁর ওপর ছেলেমেয়েদের এই নির্ভরতাকে তিনি তাই মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন না। পদে পদে তাদের তিরস্কার করেন, পীড়ন করেন। যে মাতা শিশু অবস্থায় নিজে উপযুক্ত স্নেহযত্ন হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাঁর পক্ষেও নিজের সন্তানদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করা সম্ভব। আমাদের দেশে বধূর ওপর শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা পৌরাণিক উপাখ্যানের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বধূ অবস্থায় যে বালিকাটি যতো বেশি নির্যাতিত

হয়েছে দেখা গেছে সে শাশুড়ী অবস্থায় তার পুত্রবধূদের ততো বেশী নিপীড়ন করেছে। অবশ্যই সে যে সব সময় জেনে শুনে এইরূপ আচরণ করছে সে কথা ঠিক নয়। এইরূপ আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। ঠিক একই কারণে যে মহিলাটি শিশু অবস্থায় অবহেলা পেয়েছেন তাঁর অবচেতন মনে আপন সন্তানদের অবহেলা করবার একটা রীতিমত প্রচণ্ড প্রবৃত্তি বর্তমান আছে। তাছাড়া সন্তানধারণের যে যন্ত্রণা তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অনেক জননীকে আকুল হয়ে পড়তে দেখা যায়। তাঁরা গর্ভসঞ্চারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি তাঁদের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। এই বিরক্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরও অন্তর্হিত হয় না। নতুন নিরীহ অতিথিটিকে জননী সাদর সম্বর্ধনা জানাতে পারেন না। মনের সংগোপনে একটা ক্ষোভের কাঁটা অহরহ খোঁচা মারে। গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি জননীর মনোভাব আরও অনেক কারণে বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। যে নারী অবাঞ্ছিত স্বামীর সন্তান ধারণ করতে বাধ্য হন, কিংবা অবৈধ-মিলনের ফলে যাঁর গর্ভ-সঞ্চার হয় তিনি সাধারণত' নবাগতটিকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেন না। মাতাপিতার স্নেহ, যত্ন, শ্রদ্ধা হতে বঞ্চিত হলে শিশুর মনে একটা অতি গভীর অসহায়বোধ সঞ্চারিত হয়। তার মনে ভয়, শঙ্কা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে তার মন বিকাশলাভ করতে পারে না।

আর এক ধরনের মাতাপিতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁরা অতিরিক্ত আদরযত্ন দিয়ে আপন সন্তানদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ক'রে গড়ে তোলেন। এই সব স্নেহপুত্তলিকাগুলি যখন যা আবদার করে তাই পায়। মাতাপিতা তাদের খুশী করার জন্য সর্বদাই উদগ্রীব হয়ে আছেন। বিশেষতঃ শিশুটি যদি একমাত্র সন্তান হয় তাহলে তো আর কথাই নাই। এই সব মাতাপিতার ধারণা শিশু যা চাইবে তাকে তাই দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে বেশ বড়ো রকম একটা যে সীমারেখা আছে একথাটা তাঁরা

একবারও ভাবেন না। এই সীমারেখার মধ্যে শিশুর যতোগুলি চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করা যায় ততোই ভালো, কিন্তু তার চাওয়া যখন সীমানা অতিক্রম ক'রে যাবে তখন তাকে সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় অনেক মাতাপিতা এ বিষয়টা যথারীতি অনুধাবন করতে পারেন না। রাজার একমাত্র ছেলে আবদার করলে ভিখিরীর ছেলেটাকে সারাদিন রুদ্দুরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পুত্রস্নেহান্ধ রাজাবাহাদুর আদেশ করলেন তাই হোক। তিনি একবারও ভাবলেন না তাঁর শিশুটির আনন্দবিধানের অর্থ অপর একটি শিশুর প্রাণ নাশ করা। শৈশবকালে যে সব জনক-জননীর সকল সাধ পূর্ণ হয়নি তাঁরা আপন আপন শিশুর সাধ সাধ্যমতো চরিতার্থ করবার চেষ্টা করেন। তাঁদের বিশ্বাস শৈশবে যদি তাঁদের সকল আশা পূর্ণ হতো তাহলে তাঁরা আরও অনেক বেশি উন্নতি করতে পারতেন। তাই নিজের শিশুকে নিরাশ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। শিশুদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করা যায় ততোই ভালো, কিন্তু তাদের মধ্যে যাতে করে বেশ একটি বলিষ্ঠ সমাজ-চেতনা ও নীতিবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সংযম, সহনশীলতা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিতে হবে তাদের। তা যদি না করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে শিশু যখন বাস্তব জগতে পদার্পণ করে দেখবে বিশ্বজগতের সকলেই তার মাতাপিতা নয়, সেখানে সফলতার পাশে বিফলতা আছে, চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে অনেক বিভেদ আছে তখন সে নিজেকে জগতের সঙ্গে ঠিক মতো মানিয়ে নিতে পারবে না। নিজের এবং অপরের প্রতি তার মনে অসহ্য ক্ষোভের সঞ্চার হ'য়ে তাকে অসুস্থ ক'রে তুলবে।

এমন অনেক মা বাবা দেখা যায়, যাঁরা সর্বদাই শিশুর ওপর কর্তৃত্ব ক'রে থাকেন। পদে পদে শিশুকে বাধা দেন, তার সমালোচনা করেন। শিশুর যে একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে, সেটাকে তাঁরা রূঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাঁরা চান তাঁদেরই ইচ্ছামতো

শিশু উঠবে বসবে। মাতাপিতার এইরূপ মনোভাবের নানারকম কারণ থাকতে পারে। কর্তৃত্ব করার প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত, কিন্তু এটার প্রকাশ যে রূঢ়, কটু, অসুস্থ হবে তার কোন মানে নাই। অনেক স্ত্রী স্বামীকে মোহমুগ্ধ, বশীভূত ক'রে রাখতে চান। কিন্তু স্বামীর স্বাতন্ত্র্যবোধ যদি প্রচণ্ড হয়, কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি যদি বার বার স্ত্রীর পাতা মোহজাল কেটে পালিয়ে যান, তা'হলে স্ত্রীর সকল কর্তৃত্বস্পৃহা শিশুকে কেন্দ্র ক'রে প্রবল হ'য়ে ওঠে। তাঁর অতিরিক্ত শাসনের ভারে শিশু ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে পড়ে। হয় সে অতিমাত্রায় লাজুক এবং পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, না হয় তার মনে একটা বিদ্রোহীভাবের সঞ্চার হয়।

খোকাখুকি যে দিন দিন বড় হচ্ছে, তাদের যে স্বতন্ত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ আছে, কতক কতক কাজ করবার যোগ্যতা আছে, কতক কতক কাজ করবার যোগ্যতা নাই, এ কথাটা অনেক সময় মাতাপিতা ভুলে থাকেন। সচরাচর তাঁরা শিশুর সঙ্গে একাত্মবোধ করে তার থেকে এমন অনেক কিছু দাবি করেন, যা পূরণ করতে শিশুকে মর্মান্তিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। শিশুকে এমন অনেক কাজ করতে প্ররোচিত করেন, যা সমাধা করলে শিশু অপরের প্রশংসাভাজন হবে এবং তাঁরা এইরূপ সন্তানের জনক জননী একথাটা মনে ক'রে গর্বে গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠবেন। কিন্তু এ কাজটা করার যোগ্যতা শিশুর আছে কি না, সে বিষয়ে তাঁরা ভেবে দেখেন না। ফলে বার বার অনুরূপ পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হয়ে শিশুর মনে যে গভীর হীনতার ভাব, আত্মনিগ্রহের প্রচণ্ড প্রবৃত্তির উদ্ভব হতে পারে, এই অতি মূল্যবান তথ্যটি তাঁদের মনে আসে না।

অনেক পিতা সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করেন। তাঁদের বিশ্বাস শিশুকে আদর যত্ন করার, তার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলার একমাত্র অর্থ তাকে প্রশ্রয় দিয়ে মাটি করে ফেলা। তাই শিশুর সঙ্গে তাঁরা যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, সেটা চাবুকের

সম্পর্ক, তিরস্কার এবং নির্যাতনের সম্পর্ক। এই সব শিশু অতিশয় চাপা প্রকৃতির হয় এবং তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিটা খুব প্রবল হয়ে ওঠে। আর এক ধরনের পিতা আছেন, যাঁরা অত্যন্ত ভাল মানুষ। শিশুর সঙ্গে কোন রকম কঠিন আচরণ তাঁরা করতে পারেন না। শিশু অন্যায় করলেও তাকে বকাবকি করতে জানেন না। পিতার এইরূপ আচরণের ফলেও শিশু চাপা প্রকৃতির হয়ে ওঠে; তার কারণ সে তার 'ভালমানুষ' বাবার প্রতি কোন রকম বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। পিতার সকল কাজকেই শিশু পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে না, স্বভাবতঃই তাঁর বিরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভ এবং রোষের সঞ্চার হয়। অথচ এই সমস্ত আবেগ প্রকাশ লাভ করার সুযোগ না পেয়ে মনের মধ্যেই মাতামাতি দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়। এতে তার মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্তিলাভ করতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন যদি কোন কারণে নীরস বিবর্ণ হয়ে পড়ে, তা'হলে তাঁরা কোন একটি সন্তানকে তাঁদের কাম-জীবনের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করেন। স্ত্রী সাধারণত কোন একটি পুত্রকে স্বামীর প্রতিনিধি এবং স্বামী একটি কন্যাকে স্ত্রীর প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করেন। এইরূপ মাতা-পিতা পুত্রকন্যার কামপ্রবৃত্তিকে নানাভাবে উত্তেজিত ক'রে থাকেন। তাকে অতিরিক্ত চুম্বন করেন, নিবিড় আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত ক'রে ফেলেন। সন্তানকে অতিশয় শিশু এবং অজ্ঞ ভেবে নিজের বিবিধ গোপন অঙ্গ প্রদর্শন ক'রে থাকেন এবং আরও নানাভাবে তাকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত ক'রে তোলেন। মাতাপিতার এইরূপ অসংযত ও কামময় আচরণ শিশু যৌন-জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত ক'রে তাকে অস্বাভাবিক ক'রে তোলে।

অনেক মাতাপিতাকে চরম আদর্শবাদী হ'তে দেখা যায়। তাঁরা সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চান। কিন্তু আদর্শ কোনকালেই অর্জনীয় নয়, তাই কোন কিছুতেই তাঁরা খুশী হ'তে পারেন না,

কোন সাফল্যই তাঁদের তৃপ্তিদান করতে সক্ষম হয় না। এই সব চরম উৎকর্ষবাদী মাতাপিতা তাঁদের শিশু সন্তানকেও সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলতে প্রয়াস পান এবং তাকে এমন সব কাজকর্মে প্রণোদিত করেন. যেগুলি সম্পন্ন করতে গিয়ে শিশু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে শিশুর মনে একটা সুগভীর দীনতাবোধ ও অসহায়ভাবের সৃষ্টি হয়।

মাতাপিতাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে—শিশু যেন নিজেকে কখনও অসহায় বা হীন মনে না করে। কারণ এই সব মনোভাবের উদ্ভব হলে স্বাভাবিক শিশু 'সমস্যা-শিশু' হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মনে অকারণে শঙ্কা, সঙ্কোচ ও ভয়ের উৎপত্তি ঘটে। তারা ধীরে ধীরে বহির্জগত হ'তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আকাশকুসুম রচনায় লিপ্ত হয়। যখন তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের কথা মন দিয়ে না শোনার জন্য পড়াশুনায় তারা অকৃত-কার্য হতে থাকে। মাতাপিতা ও শিক্ষকের তিরস্কার লেখাপড়ার প্রতি তাদের বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ ক'রে তোলে যার ফলে বিদ্যালয় হতে পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু ঠিক মতো দেখতে বা শুনতে পায় না ব'লে পড়াশুনা ভাল ক'রে করতে পারে না। মাতাপিতা ও শিক্ষক তাকে বুদ্ধিহীন মনে করেন এবং নানাভাবে তিরস্কার ও উপেক্ষা করে থাকেন। এর ফলে সে নিজেকে তুচ্ছ ও অপদার্থ বলে ভাবতে শেখে এবং লেখা-পড়ায় অন্যমনস্ক হয়ে কল্পনাসমুদ্রে নিমগ্ন হয়। অতিমাত্রায় অসহায়ত্ব অনুভব করার ফলে কোন কোন শিশু অতিরিক্ত পরমুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়ায় অথবা দুষ্টামি ক'রে নিজের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পায়। শিশুর মধ্যে অসহায়ত্বের অনুভূতি শুধু যে মাতাপিতার আচরণের ফলে উদ্ভূত হয় তা নয়। এর আর একটা প্রধান কারণ তার মধ্যে যে সব অসামাজিক প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে বার বার জাগ্রত হ'য়ে ওঠে সেগুলিকে শাসন ও তিরস্কারের ভয়ে দমন করার তার অক্লান্ত চেষ্টা। মানুষ মাত্রই

পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে দেবত্ব যেমন আছে পশুত্বও তেমনি আছে। অপরকে আক্রমণ করার, পরের সম্পদ অপহরণ করবার, যৌনজীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হবার সহজাত প্রেরণা সকলের মধ্যেই আছে এবং সেগুলি ক্রমাগত আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। শিশু এই সব প্রবৃত্তিকে দমন করার চেষ্টা করে। তার কারণ এগুলি প্রকাশ পেলে সে অপরের ভালবাসা হতে বঞ্চিত হবে, নিপীড়িত ও তিরস্কৃত হবে। তার এই আত্ম-সংঘাতের ফলে শিশু অনেক সময় আড়ষ্ট, উৎকণ্ঠিত ও ভীরু প্রকৃতির হয়ে পড়ে। শিশুর মনে এইরূপ আত্মসংঘাত যতো মৃদু হয়, ততোই শ্রেয়ঃ। একথার অর্থ এ নয় যে, শিশুর এই সব পাশব প্রবৃত্তিগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে। পক্ষান্তরে মাতাপিতার মনে রাখা দরকার যে, শাসন ও তিরস্কার না ক'রেও উক্ত প্রবৃত্তিগুলিকে মার্জিত ও সুপথে পরিচালিত করা সম্ভব। শিশুর পশু-প্রকৃতি প্রকাশ পেলেই যে রুষ্ট হয়ে উঠতে হবে তেমন কোন কথা নাই। ধৈর্য এবং প্রশান্তি অবলম্বন ক'রেই এই সব সহজাত প্রেরণাকে নাড়াচাড়া করতে হবে। অনেক মাতাপিতার ধারণা শাসন না করলে তাঁদের সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধারণা অতিশয় ভ্রান্ত। শাসনে যে ফল হয় না তা নয়। কিন্তু সে ফল ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শিশু স্বভাবতঃই বড়দের ভয় করে; তার কারণ সে জানে বড়রা তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। তাই বড়দের সঙ্গে সংঘাত এড়াবার জন্য সে সাময়িকভাবে তাদের কথা শোনে। কিন্তু তিরস্কার ও শাসনের মাত্রা অধিক হলে তার মনে বিদ্রোহের অথবা অস্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয়। পক্ষান্তরে শিশুকে ভালবাসলে তাকে শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়। মাতাপিতার ভালবাসার বিনিময়ে শিশু তাঁদের যথাসাধ্য খুশী করতে চায় এবং তাঁরা যা বলেন তাই করতে চেষ্টা করে। মোটের ওপর শিশুর সঙ্গে এমন আচরণ করা দরকার, যার ফলে সে নিজেকে মাতাপিতার স্নেহভাজন এবং পরমাত্মীয় মনে করতে শেখে, যেন ভাবতে শেখে

এই বিপুল বিশ্বে সে একা নয়, তার মাতাপিতা তার অবলম্বন-স্বরূপ। কিন্তু শিশুকে ভালবাসতে গিয়ে মাতাপিতা যেন অন্ধ না হয়ে পড়েন। তাঁদের শিশু চিরকাল শিশুটি থাকবে না, বহির্জগতে একদিন তাকে পদার্পণ করতে হবে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তাকে এ সব কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে তাঁদের এবং সমাজ-জীবনের জন্য তাকে যথারীতি শিক্ষা দিতে হবে। তার মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সমাজ-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ সম্পন্ন করতে হবে। মাতাপিতার মধ্যে যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-স্পৃহা আছে আগেই বলেছি সেটা সন্তানকে কেন্দ্র করে সহজেই তৃপ্তিলাভ করে থাকে। তাই তাকে স্বাধীনতা দান করা হয়তো তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে উঠবে। কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে শিশুর ভবিষ্যতকে নষ্ট করার তাঁদের কোনরূপ অধিকার নাই এবং এরূপ আচরণের কোনরূপ যুক্তিসংগত কারণও নাই। শিশু-পালন ব্যাপারে আর একটা বিষয়ের প্রতি মাতাপিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হ'ল এই যে. তাঁদের আচার আচরণ যেন যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুসম্বদ্ধ হয় অর্থাৎ তাঁদের ব্যবহারে যেন কোনরূপ দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং অসংলগ্নতা না থাকে। এইরূপ করলে শিশুর মধ্যে বেশ একটা বলিষ্ঠ বিবেকের, নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা হবে। কি ভাল, কি মন্দ, কি ন্যায়, কি অন্যায় সে সম্বন্ধে তার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে এবং সে অকারণ মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে সমর্থ হবে। অনেক সময় মাতাপিতা শিশুকে বলেন—মিথ্যা কথা বলো না. অথচ অনেক সময় তাঁরা নিজেরাই মিথ্যা কথা বলে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে শিশু ঠিক বুঝতে পারে না, মিথ্যা কথা বলা উচিত না অনুচিত। আরও একটা কথা, শিশুর কাজকে 'ছেলেমানুষি' বলে হেসে উঠিয়ে দেবার একটা ইচ্ছা আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এর ফলে শিশুর মনে আত্মপ্রত্যয় ও কর্মপ্রীতির অভাব ঘটে। তার আগ্রহ ও কৌতূহল অঙ্কুরাবস্থায়

বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় শিশুর নানারকম প্রশ্নে আমরা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকি। তার বিচিত্র জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার শক্তি আমাদের থাকে না অথবা তার অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা ক্লান্তি বোধ করি। এর ফলে শিশুর প্রকাশোন্মুখ জ্ঞান-পিপাসা বাধা পেয়ে অবাঞ্ছিত পথে ধাবিত হয়। সহিষ্ণুতা সহকারে যথাসম্ভব সত্য কথা বলে শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের উত্তরগুলো যেন শিশুর বোধাতীত না হয়। শেষ কথা, মাতাপিতাকে মনে রাখতে হবে শিশু যেন কখনও নিজেকে অসহায়, অবাঞ্ছিত এবং অশক্ত ও তুচ্ছ মনে না করে। যে কোন রকম কাজ করতে হলেই দেহ মনের একটা বিশিষ্ট পরিপুষ্টির এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন আছে। সাধ্যাতীত কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পায়ের স্নায়ু এবং পেশী-গুলি যথারীতি পুষ্টিলাভ করার পূর্বেই যদি শিশুকে বার বার দাঁড়াবার জন্যে প্ররোচিত করা হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হবে। অঙ্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য যেরূপ মননশক্তির দরকার সে শক্তি যার নাই তাকে যদি মাতাপিতা জোর করে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য প্রবৃত্ত করেন তাহলে সেও অকৃতকার্য হবে। এই অসাফল্য শিশু ও তরুণের মনে গভীর রেখাপাত করবে। তারা নূতন কিছু শিক্ষা করতে ভয় পাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরাভূত হয়ে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটি অন্যান্য ক্ষেত্রে চরিতার্থতার সন্ধান করে ঘুরবে। সমস্যামূলক নানারূপ আচরণের মধ্যে তারা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করবে কিংবা বার বার বিফল হয়ে কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠবে এবং তাদের মধ্যে নানাবিধ মানসিক পীড়ার উদ্ভব ঘটবে। তাই দুর্লভ আদর্শের মোহ সৃষ্টি না করে শিশুকে এমন কাজ দিতে হবে যা সম্পাদন করার ক্ষমতা তার আছে এবং সে নিখুঁতভাবে এই সব কাজ সম্পন্ন করছে কি না সেদিকে লক্ষ্য না রেখে সে ধীরে ধীরে এই বিষয়ে উন্নতি লাভ করছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যে শিশুর

নানারূপ অপূর্ণতা আছে তার প্রতি অতিরিক্ত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাও সমীচীন নয়। স্বাভাবিক শিশুর থেকে তাকে পৃথক ক'রে দেখলে সেও নিজেকে অযোগ্য, অপদার্থ ও করুণার পাত্ররূপে মনে ক'রতে শিখবে এবং জগতে নিজেকে সাহস সহকারে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন ক'রে শিশুর অজ্ঞাতসারেই তার অপূর্ণতা ও অক্ষমতাগুলিকে বিদূরিত করার চেষ্টা করাই বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে।

একটি শিশুকে পাঠশালায় ভর্তি করার পর কিছুদিন পরে দেখা গেল পাঠশালায় যাবার সময় হলেই সে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ছে। কিন্তু মিনিট প'তাল্লিশ পরেই সে জ্ঞান ফিরে পেতো এবং হাসিমুখে পাঠশালা যেত। যখন কারণটা আবিষ্কৃত হলো তখন দেখা গেল প্রথম ঘণ্টায় যে শিক্ষক ক্লাশ নিতেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদ্‌রাগী মানুষ। কথায় কথায় ছেলেদের শাস্তি দিতেন, ভীষণ চীৎকার করতেন এবং নির্মমভাবে শিশুদের বেত্রাঘাতও ক'রতেন। যে শিশুটির কথা বলছি তাকে তিনি কখনো বেত্রাঘাত করেন নি, তার কারণ সে ছিল খুব ছোট এবং তার পিতা ছিলেন পণ্ডিত মশায়ের বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে তার পিতা শিশুটির সম্মুখেই পণ্ডিত মশাইকে শিশুটির যত্ন নিতে অনুরোধ করেছিলেন। পণ্ডিত মশাই এই শিশুটিকে কখনো প্রহার করেন নি বটে, কিন্তু তারই সম্মুখে তিনি অন্য শিশুদের নির্মমভাবে প্রহার ক'রতেন। স্বভাবতঃই শিশুটি তার নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠতো। পণ্ডিত মশাইকে বিশ্বাস ক'রতে পারতো না। অথচ তাঁর সম্বন্ধে সে পিতার কাছে নালিশও করতে পারতো না তার কারণ তিনি কখনো তাকে শাস্তি দেননি। পাঠশালায় যেতে (প্রথম ঘণ্টায়) সে কখনো আপত্তি ক'রতো না. কারণ জানতো আপত্তি ক'রলে তার মাতাপিতা তাকে ভালবাসবেন না। সুতরাং মাতাপিতাকে খুশী করার ইচ্ছা এবং পণ্ডিত মশায়ের প্রতি ভীতি এই দ্বন্দ্বের প্রতি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার মধ্যে ভিরমি রোগের উৎপত্তি হয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে

পড়াটা তার অপরাধ নয় সুতরাং মাতাপিতা তার প্রতি ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন না, অথচ অজ্ঞান হ'য়ে পড়লে পাঠশালে যেতে হয় না এবং পণ্ডিত মশাইকে এড়ানো যায়। সুতরাং ভিরমি রোগটা হলো শিশুর উভয় সমস্যার সমাধানস্বরূপ।

আর একটি ছেলে নিপুণভাবে তার পিতার কাছে আপন কৃতিত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মিথ্যা কথা বলতো। তার কারণ তার দাদা লেখাপড়ায় খুব ভালো ছেলে ছিল এবং এজন্য তার পিতা তার দাদাকে অতিশয় ভালবাসতেন এবং সকলের সামনে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। এই ছেলেটি কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, তাই পিতার ভালবাসা লাভের চেষ্টায় সে অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ সে অন্য কাউকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে কিংবা ছবি আঁকিয়ে পিতার কাছে বলতো সে নিজেই কবিতাটা লিখেছে এবং ছবিটা এঁকেছে। শিশুরা অনেক সময় তাদের গভীর হীনতাবোধকে ঢাকবার চেষ্টায় এবং অন্যের, বিশেষ ক'রে মাতাপিতার ভালবাসা অর্জন করার লোভে নানারকম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই সব শিশুকে তাদের যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন কাজে সুযোগ দেওয়া দরকার। তাদের ভালবাসা এবং নানাভাবে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় শিশুরা মজা ক'রে মিথ্যা কথা বলে। এদের সঙ্গে মাতাপিতার এমন ব্যবহার করা দরকার যেন শিশু বুঝতে পারে তাঁরা তার মিথ্যাটাকে মজা হিসেবেই নিয়েছেন। তাঁদের উচিত শিশুর এই সব কথায় বিশেষ নজর না দেওয়া। তাহলে শিশু বুঝতে পারবে মাতাপিতা তার মিথ্যায় আগ্রহান্বিত নন। তখন সে মিথ্যার আশ্রয় ছেড়ে দেবে। মাতাপিতা শিশুর মিথ্যায় কান না দিয়ে অন্য জিনিসের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রতে পারেন। এবং তাই করা উচিত, নইলে শিশুর আত্মসম্মান ব্যাহত হবে। শিশু যখন মজা ক'রে মিথ্যা কথা বলবে তখন মাতাপিতা এমন সব প্রশ্ন ক'রতে পারেন যেন শিশু বুঝতে পারে তার চালাকিটা ধরা পড়ে গেছে—যেমনঃ তাই নাকি বেশ

মজা তো! তাঁরা যখন এমনি ক'রে তার মিথ্যাটাকে উড়িয়ে দেবেন তখন শিশু মিথ্যার অসারত্ব বুঝতে পেরে মিথ্যাচরণ ছেড়ে দেবে।

সহজ সরল শিশুকে জটিল সমস্যায় পরিণত ক'রতে মাতা-পিতার মনোভাব কতটা দায়ী আমরা এতক্ষণ সেই আলোচনাই ক'রেছি। মাতাপিতার অসুস্থ মনোভাব শিশুর আচরণকে দুর্বোধ্য ক'রে তোলার একটি প্রধান কারণ তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে। সংক্ষেপে সেই সব কারণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ক'রছি। জড়বুদ্ধিতা এইরূপ একটি কারণ। পৃথিবীতে সকল মানুষের গায়ের রঙ, উচ্চতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন একই রকম হয় না তেমনি তাদের বুদ্ধিশক্তিরও তারতম্য চোখে পড়ে। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী লোকও যেমন আছেন, ঠিক তেমনি বহু নির্বোধ ব্যক্তিও রয়েছে। শেষোক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরিমাপ সাধারণ মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ থেকেও কম হয়। বুদ্ধির অভাববশতঃ তারা আপন আপন কাজের পরিণাম যথারীতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং সহজেই কুপথে চালিত হয়ে থাকে। জড়বুদ্ধিতা দু রকমের। অনেকে জড়বুদ্ধি হয়েই জন্মগ্রহণ করে। আবার অনেকে গুরুতর শারীরিক পীড়া অথবা মানসিক আঘাতের ফলে বুদ্ধির স্বাভাবিকতা হারিয়ে জড়বুদ্ধি হয়ে পড়ে। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার জড়বুদ্ধিতাকে রোধ করা সম্ভব। সাধারণত দেখা যায় যে সব শিশু জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মেছে তাদের দেহাভ্যন্তরে কণ্ঠনালীর কাছে অবস্থিত থাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলি অপুষ্ট। অতি শৈশবে উপযুক্ত থাইরয়েড্ চিকিৎসা করালে এই সব শিশুর পক্ষেও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব নয়। তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্য নিলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের দ্বারা জড়বুদ্ধি শিশুর বুদ্ধিশক্তির বিকাশ সাধন করা সম্ভবপর হয়। অবশ্যই এই পদ্ধতিতে সুফল লাভ করতে বেশ সময়ের প্রয়োজন।

শিশুকে সমস্যামূলক ক'রে তোলার পক্ষে কুসঙ্গ আর একটি অতি প্রচণ্ড শক্তিশালী কারণ। বাড়ির চারিপাশে যারা বসবাস করে, চোখের সামনে শিশু যাদের প্রায় সব সময়ই দেখে তারা যদি দুষ্ট প্রকৃতির লোক হয় তা হ'লে অনুকরণপ্রিয় শিশু অতি সহজেই তাদের অনুকরণ ক'রে থাকে। বিশেষতঃ যে সব শিশু বিদ্যালয়ে এবং গৃহে অতিমাত্রায় তিরস্কৃত হয়, তার কুসঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানারূপ অন্যায় ও গর্হিত কাজের মধ্যে সিদ্ধিলাভ ক'রে নিজেদের প্রতিহত আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে। এই সব শিশুকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে মনস্তাত্ত্বিকরা তাদের দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরিত করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস ক'রে তারা ধীরে ধীরে যথাকালে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা, শিশুর আনন্দবিধানের জন্য গৃহে আয়োজনের অভাব, সামাজিক নিপীড়ন, উপযুক্ত নীতিশিক্ষার অভাব ইত্যাদি আরও অনেক ছোট বড় কারণে শিশু অশিষ্ট, দুরন্ত ও দুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেকটি শিশু একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সকলের জীবনেতিহাস এক নয়। তা ছাড়া মানুষের মনটি অতিরিক্ত সংবেদনশীল এবং অপরের এমন কি নিজেরও অলক্ষ্যে কখন কি একটি তুচ্ছতম ঘটনা গভীরভাবে একের মনে রেখাপাত ক'রে যায় এবং সকলের অজ্ঞাতে কী ক'রে সেই ব্যক্তির জীবনধারাটাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত ক'রে দেয় সেকথা সহজে বলা যায় না। যে ঘটনাটি একটি শিশুকে সমস্যামূলক ক'রে তুলেছে অন্য একটি শিশুর ওপর তার কোন রকম প্রভাব নাও থাকতে পারে, কারণ দুটি শিশুর মন দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে তৈরী এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার খাতায় যেসব সামগ্রী সঞ্চিত হয়ে আছে সেগুলিও এক নয়। এইজন্য শারীরিক চিকিৎসকের মতো মনোবৈজ্ঞানিক শিশুকে দেখা মাত্রই কোন বাঁধাধরা সূত্র অবলম্বন ক'রে

প্রতিষেধের তালিকা তৈরী ক'রে দিতে পারেন না। এজন্য চাই মাতাপিতা শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা এবং বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তদৃষ্টির তীক্ষ্নতা। আমাদের দেশে এ বিষয়ে গবেষণা করার যদি যথেষ্ট সুযোগ ঘটে তা হ'লে অনেক কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে মনোবিজ্ঞানীরা জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর ও সমাজকে মধুরতর করতে পারবেন এই আশাই করছি।